সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী নং ১৯

নব্য
রসায়নী বিদ্যা
ও তাহার
উৎপত্তি

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রণীত

ওরে বাছা! মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?

শ্রীমধুসূদন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা:—৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটি বুক্ সোসাইটীতে প্রাপ্তব্য।

১৯০৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৬০	১৫	আবিষ্কার	প্রকাশ
৬১	২০	কপিল	কপিশ
৬২	১	নিভূ্র্ল	নির্ভুল
৬৫	৬	রশ্মির সহিত	রশ্মি হইতে
৬৬	১৫	যফল	সফল
৬৮	৯	পৃষ্ঠে	পৃষ্ঠায়

ভূমিকা।

অধিক দিনের নয়—পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, লেখকের মনে এই সংস্কার ছিল যে যখন ইংরাজী আমাদের রাজভাষা এবং শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয় তখন মাতৃ ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রণয়নের প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ পারিভাষিক শব্দ সকল সংকলন করা বড়ই দুষ্কর ব্যাপার। এই সকল শব্দ যে কেবল দুরূহ তাহা নয়, অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ ও শ্রুতিকটু। বাস্তবিক যাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা ও অধ্যয়ন করেন তাঁহারা জানেন যে ইংরাজীতে এই বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করা কত সুখকর। বাঙ্গালা ভাষায় কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পড়িতে গেলে তাহার ইংরাজী পরিচ্ছদ, অবয়ব ও স্বরূপ মানস নেত্রের সম্মুখে অগ্রে উপস্থিত হয়। এমন কি মাঝে মাঝে ইংরাজী কোন্ কথার কি পরিভাষা ব্যবহার হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য থমকিয়া দাড়াইতে হয়। সকল স্থানে সম্যক্‌রূপে ভাব পরিগ্রহও হইয়া উঠে না। এই সকল কারণে অগ্রসর হওয়া দায়। আমার বেশ মনে আছে যখন আমি সর্ব্বপ্রথম রসায়নশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করি মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট একখানি বাঙ্গালা "সরল" রসায়নে carbon dioxide (carbonic acid gas) কার্ব্বন ডাইঅক্‌সাইড এই শব্দের অনুরূপ পরিভাষা "দ্ব্যাম্লিকাঙ্গার" আমায় বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিল। মনে করুন বক্তৃতা দিবার সময়—"In soda-water there is carbonic acid gas dissolved" তাহার স্থলে "সর্জ্জিকাক্ষার বারিতে দ্ব্যাম্লিকাঙ্গার বায়ু দ্রবীভূত আছে" ব্যবহার কর গেল। তবেই ত বিপদ। প্রায় আট বৎসর হইল শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

সাহিত্য পরিষদে "রাসায়নিক পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহার সমালোচনায় অক্সাইড অব ক্লোরিণ (oxide of chlorine)-এর অনুরূপ "দগ্ধহরিণ" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে দেখিয়া বলিয়াছিলাম যে অনেক বিলাত ফেরত পাঠকের roast venison-এর কথা মনে পড়িয়া মুখে লালা সঞ্চার হইবে।

যাহা হউক তীব্র সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করা বড়ই সহজ। একটু প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক। এখন শিক্ষিত অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিমাত্রেই আজ কাল কিছু না কিছু বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় বা কয়জন? প্রতি বৎসর এফ,এ ও বি,এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দেখিয়া আমরা ভয় পাই। কিন্তু ভেবে দেখুন আট কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে ৪।৫ হাজার ছাত্র সমুদ্রে শিশির বিন্দু তুল্য। অন্যদিক হইতে একটী উদাহরণ লওয়া যাক। স্বদেশীয় মহোদয়গণ পরিচালিত কয়েকখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র আছে তাহার পাশাপাশি কয়েকখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রও এদেশে চলিতেছে। গড়পড়্তা ধরিলে বোধ করি এমন দাঁড়াইবে যে ইংরাজী সংবাদ পত্র অপেক্ষা বাঙ্গালা খবরের কাগজের পাঠক সংখ্যা অন্যূন বিশগুণ। হইতে পারে যে দুই একখানি সংবাদ পত্রে সকল সময়ে সুরুচিপূর্ণ পাঠোপযোগী প্রবন্ধ থাকে না। কিন্তু স্পর্দ্ধার সহিত একথা বলা যাইতে পারে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত জগতের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতি নানাবিষয়ক জ্ঞানগর্ভ অবশ্য জ্ঞাতব্যবিষয় প্রকাশিত ও আলোচিত হয়। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি একটী সারগর্ভ প্রবন্ধে বেশ বলিয়াছেন যে আমাদের ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়াছে যে "শিক্ষা" সম্বন্ধে এই বুঝি যে "কোন মতে সাড়ে

নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যা শিক্ষার হরিণবাড়ীর মধ্যে হাজির দেওয়া।" এখন সংবাদ পত্রগুলি জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের একটী প্রধান সহায়ও অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই জানেন মহামতি কব্‌ডেন একবার পার্লেমেণ্ট মহাসভায় বলিয়াছিলেন যে সমগ্র গ্রীক ইতিহাস অর্থাৎ হেরোডোটাস (Herodotus), থিউসিডাইডিস (Thucydides) ইত্যাদি পড়িয়া যাহা না শিখা যায় একখানি টাইম্‌স (Times) পত্রিকা পাঠ করিলে তাহা অপেক্ষা বেশী জ্ঞানলাভ হয়। দেশের দুর্গতি ও দুরবস্থার বিষয় এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে যত দিন একদিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে কোটী কোটী নরনারী অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিবে তত দিন আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা খুব কম। যাঁহারা ইংরাজীভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিখিতেছেন তাঁহারা অগাধ জলরাশির মধ্যে শিশির বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মহামতি বাক্‌ল ইংলণ্ড ও জর্ম্মানদেশের শিক্ষাবিস্তার তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে জর্ম্মান দেশে সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে জর্ম্মান দেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক "পণ্ডিতী" ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ "গণ্ডীর" মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতর স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ও জন সাধারণের মধ্যে একরূপ একটী অনতিক্রম্য প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণের বোধগম্য

অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জন সাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূলমর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের দেশে অত্যধিক প্রবল। আরও একটী কথা, আমরা এতক্ষণ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ও নীরেট অজ্ঞদলের কথা বলিলাম। ইহার মাঝামাঝি একদল পণ্ডিত রহিলেন। অর্থাৎ যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যানে রতী। ইঁহারা কলাপ ও পাণিনি; কালিদাস, মাঘ ও ভারবী; জটিল ন্যায়শাস্ত্র, এতদ্ভিন্ন বেদ, বেদান্ত ও দর্শন লইয়াই ব্যস্ত। মোটামটি বলিতে গেলে তাহারা ১৫০০ হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতে বাস করেন। ইঁহাদিগকে আমরা অবশ্য আধুনিক শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে গণনা করিতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু আবার ইঁহারাই সমাজে "পণ্ডিত" উপাধিধারী এবং ইঁহাদের আধিপত্য জনসাধারণের উপর ব্রিটিশশাসন অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ও কঠোর। এই শ্রেণীকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। ইঁহাদের একদেশে সেকেলে শিক্ষার জন্য সমাজে যে কুফল ও অনিষ্ট সাধন হইয়াছে তাহা সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিবেন যে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণী লোপ প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে "উপাধি" প্রদানের যে পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহার "আদ্য" "মধ্য" ও "উপাধি" এই তিন বিভাগে কেবল বঙ্গদেশে প্রতিবৎসর ন্যূনান ৪৫০০ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়া থাকেন। সমগ্র টোলের ছাত্র সংখ্যা ইহাপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে এমত সহস্র সহস্র ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণের হাতে পৌঁছিবে যাহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের পক্ষে কদাচ সম্ভব নয়।

অবশ্য যাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়া মৌলিকতত্ব নির্ণয় ও গবেষণায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইংরাজী কেন জর্ম্মান ও ফরাসীভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীও পাঠ করিতে বাধ্য হন।

আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে যাঁহারা "শিক্ষিত" বলিয়া অভিহিত তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূল তাৎপর্য্যগুলি জানা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাধারণ বিষয়গুলি মোটামুটি জানা বিশেষ আবশ্যক। রুষ ও জাপান দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ নিজ নিজ ভাষাকে এত দরিদ্র ও হেয় জ্ঞান করিতেন যে ১৫। ২০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা জর্ম্মন, ফরাসী বা ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ প্রচার করিতেন। কিন্তু এখন তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে মাতৃভাষায় গ্রন্থ প্রচার না হইলে স্বদেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয় না। আমি জানি প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন আমি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম আমার দুই জন বন্ধু, যাঁহারা এখন রাসায়নিক জগতে সুপরিচিত, বাধ্য হইয়া রুষভাষা শিক্ষা করেন কারণ সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবেত্তা মেণ্ডেলেফ্ (Mendeleef: discoverer of the Periodic Law) জর্ম্মানভাষা পরিত্যাগ করিয়া নিজ অর্থাৎ রুষভাষায় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। সম্প্রতি দেখিতেছি জাপান দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণও এই পথ অবলম্বন করিতেছেন। আমাদেরও চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। "সাহিত্য পরিষৎ" এবিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় রাসায়নিক ও অন্যান্য পরিভাষা প্রণয়ন করিয়া এবিষয়ে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ও এ বিষয়েশ্রম স্বীকার করিতে ত্রুটী করেন নাই। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় সাময়িক

পত্রিকায় যে সকল সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতেছেন তাহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে একটু যত্ন করিলে পরিভাষার জন্য কাজ আটকায় না। *

হিন্দুজাতি রসায়নশাস্ত্রে কতদূর পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া আজ ১৭ বৎসর যাবৎ অনেক প্রাচীন বৈদ্যক ও তান্ত্রিকগ্রন্থ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে হইয়াছে। ইহাতে জানা গিয়াছে যে বহুকাল হইতে এদেশে অনেক গুলি পারিভাষিক শব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু সে গুলি আমরা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়া নূতন শব্দ সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহাতে আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রোক্ত শব্দ গুলির পুনরুদ্ধার হইয়া প্রচারিত হয় এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সময়ে সময়ে পূর্ব্ব-প্রচলিত শব্দগুলির এমন অপব্যবহার হইয়াছে যে তজ্জন্য ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ৪৭ পৃষ্ঠার "পরিস্রুত বারি" শীর্ষক প্রস্তাব পড়িলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই। পাঠকগণ মনে রাখিবেন রসায়ন-শাস্ত্রের উৎপত্তিও আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তবে প্রসঙ্গক্রমে এই শাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ কতকগুলি মূল তাৎপর্য্য সাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জটিল বচন ব সূত্রগুলি একবারে বর্জ্জন করা গিয়াছে। রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন গ্রীক, আরব্য ও হিন্দুদিগের মধ্যে যে সমস্ত ভাব প্রচলিত ছিল তাহারা পরস্পর বিরোধী নয়। বরং অন্তর্নিহিত সূত্রগুলি প্রায়ই এক রকম। এই সকল মতের সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় "রসায়ন" শব্দ আরব্য "কিমিয়া" এবং ইংরাজী "কেমিষ্ট্রির" পরিবর্ত্তে

* কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা ও এই বিষয়ে ব্রতী হইয়া প্রশংসাই কার্য্য করিতেছেন।

ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে কিন্তু এই শব্দটী সুনির্ব্বাচিত ও সম্যক মনোনীত বোধ হয় না। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহাদের নিকট ইহা ভিন্নার্থ বোধক। যে ভেষজ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ওজস্কর ও রোগীর রোগ নাশক তাহাই বৃষ্য বা রসায়ন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—ত্রিফলা রসায়ন, লৌহ রসায়ন ইত্যাদি।* যে বিদ্যাবলে রসায়ন প্রস্তুত করণের জ্ঞানলাভ হয় প্রকারান্তরে সেই বিদ্যাকেও রসায়ন বলা হইতেছে। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে এই বিদ্যাকে "রসসিদ্ধি" নাম দেওয়া হইয়াছে এবং যাঁহারা এই বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহারা "রসসিদ্ধ" বা "রসসিদ্ধিপ্রদায়ক" নামে অভিহিত।† রুদ্র-যামলান্তর্গত "ধাতুক্রিয়া" নামক তন্ত্রে এই বিদ্যা রসায়নীবিদ্যা নামে উক্ত হইয়াছে। আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক বিভাগের প্রধান সহকারী শ্রীযুক্ত গোপীভূষণ সেন এই গ্রন্থ সঙ্কলন বিষয়ে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। অন্যতম সহকারী শ্রীমান বিধুভূষণ দত্ত "নব্যতর রসায়নীবিদ্যা" শীর্ষক অধ্যায় লিখিয়াছেন সুতরাং ইহা তাঁহারই নামে প্রচারিত

* চরক—চিকিৎসা-স্থান ১ম অধ্যায়।
শার্ঙ্গধর বলিলেন—রসায়নঞ্চতজ্জ্ঞেয়ং যজ্জরাব্যাধিনাশনম্।
† যথাঃ—সপ্তবিংশতি সংখ্যকা রসসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ। —ইতি রসরত্ন সমুচ্চয়
"History of Hindu chemistry", 2nd ed. ৭৯ ৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রথম অধ্যায়।

ফ্লজিষ্টনবাদ ও নূতন বায়ুর আবিষ্কার।

আমরা যে কয় জন বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারকাহিনী বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম তাঁহাদিগকে নব্য রসায়নী বিদ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের মধ্যে জোসেফ প্রীষ্টলির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য।

জোসেফ প্রীষ্টলি দরিদ্রের সন্তান। শৈশবে তাঁহার উপযুক্তরূপ শিক্ষালাভ ঘটে নাই। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তিনি পাঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। প্রথমাবস্থায় তিনি ধর্ম্মযাজক ছিলেন। কিন্তু তোত্‌লা বলিয়া শ্রোতৃবর্গ তাঁহার উপদেশে বিশেষ আকৃষ্ট হইতেন না। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অবশেষে তাঁহাকে গণিতশাস্ত্র এবং ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়। অবসর মত তিনি পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় নানা প্রকার গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিতেন। ক্রমে অনেক প্রকার "বায়ু" (গ্যাস) তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। পরে যে হাস্যোদ্দীপক বায়ুর কথা উল্লিখিত হইবে উহা ঐ সকল বায়ুর অন্যতম।

অনুমান ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চৌত্রিশ বৎসর বয়সে প্রীষ্টলি রসায়ন জগতে যে যুগান্তর উপস্থিত করেন, তাহা সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে সে সময়ে দহনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে জন সাধারণের কিরূপ ধারণা ছিল তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। "শুষ্ক কাষ্ঠ অগ্নি সংযোগে প্রজ্জলিত হয়, কিন্তু প্রস্তর প্রজ্জলিত হয় না কেন?" প্রাচীন পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। ষ্টাল প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলিতেন যে কাষ্ঠে একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ অলক্ষিতভাবে আছে, এ নিমিত্তই কাষ্ঠ দহনশীল। অঙ্গার, গন্ধক, তৈলাদি দাহ্য বস্তুতেও এই সূক্ষ্ম পদার্থ বর্ত্তমান আছে এবং ইহার ভৌতিক (material) অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। এই সূক্ষ্ম পদার্থকেই তাঁহারা ফ্লজিষ্টন (phlogiston) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে দাহ্যবস্তু মাত্রই যৌগিক পদার্থ এবং ফ্লজিষ্টন প্রত্যেকেরই অন্যতম উপাদান। দাহ্য বস্তু সমূহে পরস্পর যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয় তাহা কেবল ফ্লজিষ্টনের পরিমাণের তারতম্য বশতঃ এবং অন্যতর উপাদানের ধর্ম্মভেদে ঘটিয়া থাকে।

দহনকালে যে বস্তু দগ্ধ হইতেছে, তাহার ফ্লজিষ্টন বহির্গত হইয়া যায় এবং এই নিমিত্তই উত্তাপ, আলোক ও অগ্নিশিখা পরিলক্ষিত হয়। এই ফ্লজিষ্টনই সর্ব্বপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের মূলে বর্ত্তমান। একটা উদাহরণ লওয়া যাক। যথাঃ—দস্তা উত্তাপ প্রয়োগে প্রজ্জলিত হইয়া এক প্রকার শ্বেত ভস্মে পরিণত হয়।

যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া গেলে দগ্ধাবশেষ থাকে সেইরূপ ধাতুও অগ্নিদগ্ধ হইলে "ধাতুভস্ম" অবশিষ্ট থাকে। এই ধাতুভস্ম অত্যন্ত লঘু। আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহৃত "মারিত" বা "পুটিত" লৌহ এত লঘু যে ফুৎকার প্রয়োগে উড়িয়া যায়। এমন কি জলের উপর নিক্ষেপ করিলে

উহা ভাসিতে থাকে।* এই কারণে লোকের ধারণা ছিল যে ধাতু মাত্রেই যৌগিক পদার্থ এবং লঘুতর ধাতুভস্মই ইহার অন্যতম উপাদান। সাধারণতঃ এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইলেও ইহা যে ভ্রমসঙ্কুল তাহা পরে প্রতিপন্ন করা যাইবে।

হিন্দু দার্শনিকগণ অন্যপ্রকারে এই সমস্যার পূরণ করিতেন। তাঁহাদের মতে কাষ্ঠাদি পদার্থ সমূহ পঞ্চভূতাত্মক। ইহাদিগের বায়বীয় উপাদানগুলি অগ্নি সংযোগে চলিয়া যায়, কেবল "ক্ষিতি"র অংশ টুকু অবশিষ্ট থাকে। ইহাই ভস্ম। সুতরাং যে পরিমাণ কাষ্ঠ বা ধাতু ভস্মীভূত হয়, ভস্মাবশিষ্ট পদার্থ তদপেক্ষা অনেক লঘু হইয়া থাকে।†

ইয়ুরোপীয় রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বলিতেন যে ধাতুভস্ম এবং "ফ্লজিষ্টন" এই দুই যৌগিক পদার্থের সংযোগে ধাতু উৎপন্ন হয়। উত্তাপ প্রয়োগে এই ফ্লজিষ্টন দূরীভূত হইলে কেবল ভস্ম পড়িয়া থাকে।

আরব দেশীয় রাসায়নিক পণ্ডিতগণের মতে পদার্থ মাত্রই লবণ গন্ধক এবং পারদ সংযোগে উৎপন্ন।‡ গন্ধক থাকে বলিয়াই পদার্থ

---

* মৃতং লোহং তদ্ধ্বৃন্দষ্টং রেখাপূর্ণাভিধানতঃ
হংসবৎ তীর্য্যতে বারিণ্যুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।

† বৈশেষিক দর্শনমতে তৈলাদি দাহ্য পদার্থে "স্নেহ" বর্ত্তমান আছে; ইহাই অগ্নি প্রজ্বলনের কারণ।

‡ এই শব্দত্রয় দ্রব্যের গুণজ্ঞাপক বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ

লবণ = অদাহ্যভাগ (ভস্ম),
গন্ধক = দাহ্য ,,
পারদ = তেজঃ, জ্যোতি ইত্যাদি।

ধাতু মাত্রেই পারদের অংশ আছে বলিয়া ধাতুর গুণবিশিষ্ট (ধাতুর "মারণ" ও "পুনর্জ্জীবিত করণ" দ্রষ্টব্য)

সমূহ অগ্নিতাপে দগ্ধ হয়। এবং পারদের জন্যই পদার্থ বিশেষে ধাতব-গুণ বর্ত্তমান আছে। আবার লবণ বর্ত্তমান থাকার জন্যই ধাতু নিচয় দ্রবীভূত হইতে পারে।

এই আরবীয় সিদ্ধান্তের সহিত হিন্দুদিগের পঞ্চভূতবাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। এমন কি অনেকে অনুমান করেন যে আরবগণ এ বিষয়ে হিন্দুদিগের নিকট ঋণী। টালের ফ্লজিষ্টন বাদ আবার আর-বীয় "লবণ-গন্ধক-পারদ" বাদের রূপান্তর বিশেষ।

যাহা হউক য়ুরোপে ফ্লজিষ্টনবাদ কিছু কালের জন্য আদৃত হইয়া ছিল, কিন্তু প্রীষ্টলি, ক্যাবেণ্ডিস, লাবোয়াসিয়ে প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পরীক্ষা দ্বারা অচিরে উহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই বিষয় বিস্তৃতরূপে বলা যাইতেছে।

বহুকাল হইতে তান্ত্রিক মতে "পারদভস্ম" ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পারদভস্ম তিন প্রকার হইতে পারে বলিয়া তন্ত্রে উক্ত আছে, যথা—শ্বেতভস্ম, কৃষ্ণভস্ম ও লোহিত ভস্ম। প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভেদে এই লোহিতভস্ম আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা হিঙ্গুল ও রসসিন্দূর বা মকরধ্বজ। এই দুই শ্রেণীর লোহিত ভস্ম ভিন্ন আর এক প্রকার লোহিতবর্ণ ভস্ম আছে। তাহা আমাদের দেশে বড় প্রচলিত ছিলনা, কিন্তু স্থল বিশেষে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই লোহিত ভস্ম প্রস্তুত করিবার জন্য লবণ গন্ধক বা স্ফটিকারি প্রভৃতি কোন পদার্থের প্রয়োজন নাই। পারদকে অগ্নি সন্তপ্ত করিলে তাহার উপরি ভাগে সরের ন্যায় "পারদ মল" জমিতে থাকে (১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিশেষ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে এই "সর" রক্তবর্ণ ক্ষুদ্রায়তন দানার সমষ্টি মাত্র।

কিন্তু কেবল উত্তাপ প্রয়োগেই যে পারদ এই প্রকার ভস্মে পরিণত হয় তাহা নহে। বাহির হইতে বায়ু প্রবেশের প্রশস্ত পথ থাকা

আবশ্যক। তাহার নিমিত্ত উত্তাপ যন্ত্রের গঠন বিশিষ্ট প্রকারে হওয়া চাই। তাহা না হইলে উত্তাপ সংযোগে পারদ কেবল ঊর্দ্ধগামী হইবে (উবিয়া যাইবে); এই কারণে রসার্ণবে "যন্ত্রবিদ্যা মহাবলা" উক্ত হইয়াছে এবং রসসিদ্ধিপ্রদায়কগণ ঔষধ ব্যতিরেকেও পারদ ভস্মীকরণ সম্বন্ধে বিস্ময় ও প্রশংসা প্রকাশ করিয়াছেন।* তরল ও চপল পারদের সহিত অন্য কোন বস্তু সংযুক্ত না করিয়া ও উহার কঠিন (solid) লোহিত বর্ণ ভস্মে পরিণতি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। এই লোহিত ভস্মকে প্রাচীন আরবীয় রাসায়নিকগণ mercurius calcinatus per se বা প্রকৃত পারদভস্ম নামে অভিহিত করিতেন। প্রীষ্টলি এই লোহিতভস্ম লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা করেন। একদা আতসকাচ† দ্বারা সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া এই লোহিত ভস্ম উত্তপ্ত করিতেছিলেন, তাহাতে এক প্রকার "বায়ু" (গ্যাস) নির্গত হইতে লাগিল। প্রীষ্টলি এই নূতন বায়ুর একটী অভিনব গুণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে ইহাতে দাহ্য পদার্থ সকল অতি সহজে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি সহকারে দগ্ধ হইতে লাগিল।

পারদের পরিবর্ত্তে যদি সীসক গলান যায় এবং ক্রমাগত লৌহদণ্ড দ্বারা মন্থন করা যায় তাহা হইলেও এক প্রকার লোহিত বর্ণ ভস্ম উৎপন্ন হয়, তাহাই তান্ত্রিক শাস্ত্রোক্ত 'নাগসিন্দুর', চলিত ভাষায় ইহাকে মেটে সিঁদূর বলে॥

---

* জারণে সারণে চৈব রসরাজস্য রঞ্জনে
যন্ত্রমেব পরং কর্ম্ম যন্ত্রবিদ্যা মহাবলা
ঔষধিরহিতশ্চায়ং হঠাৎ যন্ত্রেন বধ্যতে
তস্মাৎ যন্ত্রবলং চৈকং বিলজ্জ্যং বিজানতা। —রসার্ণব।

† আতস কাচ (Burning glass) সাহায্যে যথেষ্ট উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কথিত আছে যে সিরাকুজ অবরোধের সময় আর্কিমিডিস্ ইহার দ্বারা রোমীয় বিদগ্ধ পোত করেন।

প্রীষ্টলি নাগসিন্দুর হইতেও পূর্ব্বোল্লিখিত বায়ু প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পারদ ও সীসকভস্ম হইতে যে বায়বীয় পদার্থ বাহির করিলেন তাহা লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে এই "বায়ুতে" বর্ত্তিকাও কাষ্ঠাদি পদার্থ সমূহ বিশেষ উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতে থাকে এবং ইহার দ্বারা শ্বাসপ্রক্রিয়া অতি সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। প্রীষ্টলি আরও দেখিতে পাইলেন যে ইন্দুর বদ্ধ বায়ুতে যতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে সাধারণ বায়ুর পরিবর্ত্তে যদি এই নূতন বায়ু ব্যবহার করিতে পায় তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় জীবিত থাকিতে পারে।

যে প্রকার প্রাচীন ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে প্রীষ্টলি নূতন নূতন বায়ু আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল :
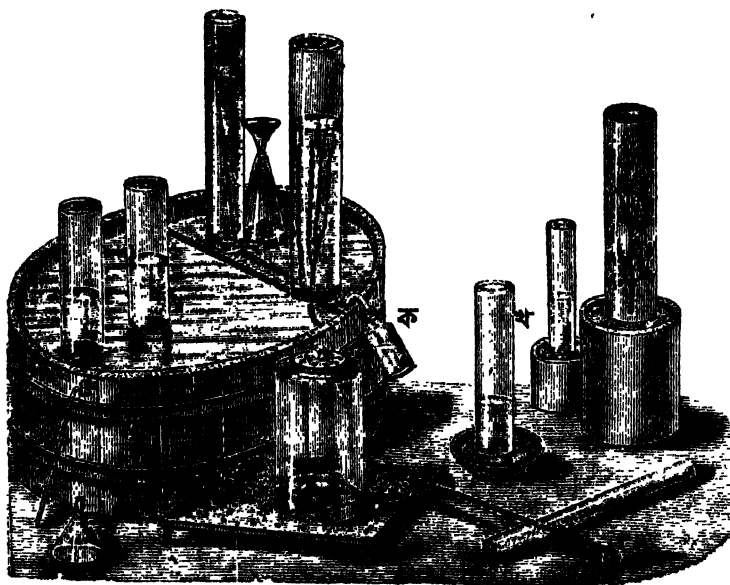
ক একটি বোতল। ইহার মধ্যে লৌহচূর্ণ ও গন্ধকদ্রাবক সংযোগে উৎপন্ন উদ্‌জান বায়ু সংগৃহীত হইতেছে। জলপূর্ণ একটী পিপার মধ্যে সচ্ছিদ্রকাষ্ঠফলকের উপর কতকগুলি স্তম্ভাকৃতি জলপূর্ণ কাচপাত্র উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে। এইগুলি ক্রমশঃ নানাবিধ বায়ুতে পূর্ণ হইতেছে। খ, স্তম্ভাকৃতি কাচপাত্রে পারদ বা জলের উপর সংগৃহীত "বায়ু" আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।
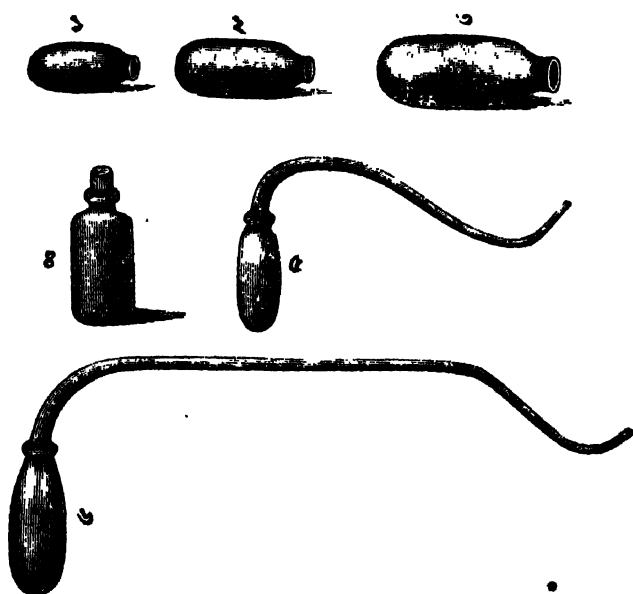
প্রীষ্টলি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত নানাবিধ বকযন্ত্র ও কাচকূপী।

প্রীষ্টলি অনেক প্রকার নূতন বায়ু আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এই জন্য তিনি বায়বীয় রসায়ন শাস্ত্রের আদিগুরু বা জন্মদাতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে সময় প্রীষ্টলি এই সমস্ত গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন ঠিক সেই সময়ে সুইডেনের

রাজধানী ষ্টকহলম নগরে এক দরিদ্র যুবক কোন ঔষধালয়ের একটী নিভৃত প্রান্তে বসিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে উদ্ভাবিত প্রণালীমতে নানাবিধ পরীক্ষা করিতে করিতে অম্লজান বায়ু স্বতন্ত্র ভাবে আবিষ্কার করেন। একটী কাচের কূপীতে সোরা রাখিয়া বালুকা যন্ত্রের উপর প্রচণ্ড উত্তাপ দেওয়া হইতেছে—অম্লজান বায়ু নির্গত হইয়া ক "ফুকনির" (bladder) মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং উহা ক্রমশঃ স্ফীত হইতেছে। এই প্রকারে "বায়ু" সংগ্রহ করিতে পারা যায় বটে—কিন্তু উহা প্রশস্ত উপায় নয়—কারণ এস্থলে "বায়ুর" সহিত সাধারণ বাতাস মিশ্রিত হইয়া থাকে। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময়ে ইংলণ্ড ও সুইডেনের
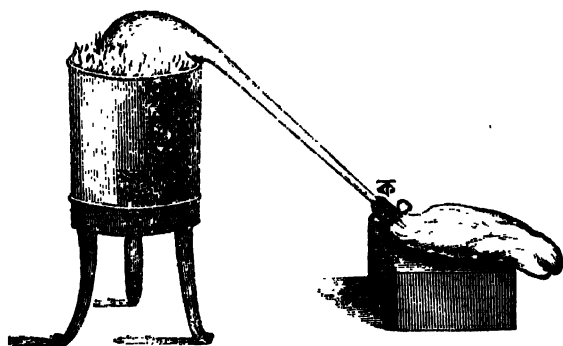
মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা ছিলনা সুতরাং প্রীষ্টলি ও উক্ত সুইডেনবাসী শীলে (Scheele) সমসাময়িক হইলেও কেহ কাহারও পরীক্ষার বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন না।

প্রীষ্টলি এই আবিষ্কার করিলেন বটে কিন্তু তিনি ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম সম্যক গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। বংশপরম্পরাগত সংস্কারগুলি মানব হৃদয়ে এমন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল থাকে যে নূতন আলোক পাইলেও আমরা তাহার সাহায্যে সহসা পথ দেখিতে পাই না।

আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা বহুকাল হইতে সমাজের স্তরে স্তরে এমন প্রবেশ করিয়াছে যে শিক্ষিত হইয়াও আমরা তাহার প্রভাব এড়াইতে পারিনা। চাউল জল দিয়া কিছু কাল সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। এই প্রক্রিয়া হিন্দুই হউক বা মুসলমানই হউক, ব্রাহ্মণ হউক বা চণ্ডাল হউক যেই করিবে তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু শুদ্রের "হাতে" ব্রাহ্মণ ভোজন করিবেন না। যদি বুঝিতাম শুদ্রের দ্বারা অন্ন পাক হইলে উহা ভালরূপ প্রস্তুত হয় না, বা তাহার মধ্যে কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহাই কি? যদি কোন "উচ্চ-বর্ণকে" জিজ্ঞাসা করেন যে "হীনবর্ণের" প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ভোজনে কি দোষ তাহা হইলে তাহার কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর পাইবেন না। 'খাইতে নাই' এই পর্য্যন্ত – যিনি বড় শাস্ত্রজ্ঞ তিনি হয় ত মনু-সংহিতা হইতে দুই একটা শ্লোক আবৃত্তি করিবেন।

প্রীষ্টলিও প্রচলিত মতের বাহিরে যাইতে সাহসী হন নাই। পর অধ্যায়ে দেখা যাইবে যে তাঁহার আবিষ্কারের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে কেবল ফরাসী দেশে একজন বৈজ্ঞানিক সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

লাবোয়াসিয়ে ও অম্লজান।

প্রীষ্টলির নানা বিষয়িণী প্রতিভা কেবল রাসায়নিক রহস্য উদ্ঘাটনে নিয়োজিত থাকিত না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কূটতর্ক ও ব্যাকরণ শাস্ত্র আলোচনা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। একাগ্রচিত্ততার অভাবে তিনি নব্য রসায়নশাস্ত্রের প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাবোয়াসিয়ে সে গৌরবের অধিকারী।

পূর্ব্বে আমরা ধাতুভস্মের কথা উল্লেখ করিয়াছি। লাবোয়াসিয়ে বঙ্গভস্ম লইয়া বহু পরীক্ষা করেন। কি উপায়ে বঙ্গ (রাং) ভস্মে পরিণত হয় ও কেন হয় এই বিষয় অনুসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত থাকেন।

প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক দার্শনিকগণ পদার্থবিদ্যাঘটিত অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই কার্য্যতঃ পরীক্ষা না করিয়া কেবল অনুমানের উপর বেশী নির্ভর করিতেন। আমাদের দেশের নৈয়ায়িকগণ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রাচীন জ্ঞানিগণ এবিষয়ে কেবল মানসিক চিন্তা ও কূটতর্ক করিতেন মাত্র সুতরাং তাঁদের বাদানুবাদ বিশেষ কোন ফলোপদায়ক হয় নাই।

বঙ্গভস্মও তন্ত্রোক্ত ঔষধে প্রয়োজ্য। ইহারও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সীসকভস্মের অনুরূপ। সাধারণতঃ বোধ হয় যে বঙ্গভস্ম বঙ্গাপেক্ষা লঘু। লাবোয়াসিয়ে কিন্তু দেখিলেন যে, যে ওজনের বঙ্গ মারিত হয়

সমগ্র ভস্ম তদপেক্ষা গুরু। সুতরাং মারণকালে বঙ্গ হইতে কোন উপাদান দূরীভূত না হইয়া বরং বাহির হইতে অন্য কোন নূতন পদার্থ বঙ্গের সহিত আসিয়া যুক্ত হইয়া থাকে। (২—৩ পৃষ্ঠা ফ্লজিষ্টন বাদ দেখুন।)

কিছু দিন পরে লাবোয়াসিয়ে পারদ ভস্ম লইয়া প্রীষ্টলির পরীক্ষার সত্যতা অবধারণ করিলেন। তিনিও দেখিলেন যে লোহিতবর্ণ পারদ ভস্ম হইতে এক প্রকার বায়ু নির্গত হয়, তাহাতে নির্ব্বাণপ্রায় শুষ্ক কাষ্ঠ, বর্ত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্য পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া অতি উজ্জ্বলরূপে দগ্ধ হয়। লাবোয়াসিয়ে অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন লোক ছিলেন। বঙ্গমারণ প্রক্রিয়া হইতে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারা দৃঢ়মূল হইল। ইহার পর তিনি আর একটী পরীক্ষা করেন। একটী বকযন্ত্রে কিছু পারদ ন্যস্ত করিয়া বকযন্ত্রের গলদেশ অপর একটী পাত্রস্থিত পারদে ডুবাইলেন। তৎপরে এক পক্ষ কাল বক যন্ত্রস্থ পারদে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দেখিলেন যে পারদের উপর এক প্রকার রক্তবর্ণ স্তর পড়িতেছে। তিনি আরও দেখিলেন যে অপর পাত্রস্থিত পারদও ক্রমশঃ খ পাত্রের ভিতর উঠিতেছে। ইহার কারণ এই যে বকযন্ত্রের মধ্যস্থিত বায়ুর
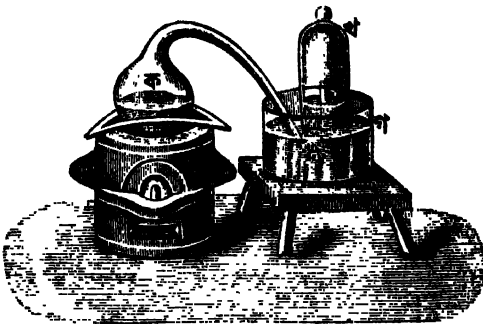
ক, বকযন্ত্র ; খ, বায়ুপূর্ণ ঘণ্টাকৃতি পাত্র ; গ, পারদের আধার।

কিয়দংশ যখন পারদসংযোগে অপসারিত হইল তখন আভ্যন্তরিক বায়ুর চাপ অপেক্ষাকৃত কমিয়া গেল; সুতরাং বাহিরের বায়ুর চাপ (atmospheric pressure) বশতঃ পারদ ক্রমশঃ খ পাত্রের ভিতর উঠিতে লাগিল। পল্লিগ্রামের অনেক বালকই পেঁপের ডাঁটা দিয়া খেজুর রস টানিয়া খায়। ভিতরের বাতাস টানিয়া লইলেই রস ক্রমশঃ নলের ভিতর উঠিতে থাকে।

লাবোয়াসিয়ে এই পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে সাধারণ বায়ুতে এমন এক উপাদান আছে যাহা উত্তাপ প্রয়োগে পারদের সহিত সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ এই লোহিতবর্ণ ভস্ম একটী যৌগিক পদার্থ। এই যৌগিক পদার্থ পুনর্ব্বার তীব্রতররূপে উত্তপ্ত হইলে বিশ্লিষ্ট হয়। এবং উপরিউক্ত বায়বীয় উপাদান বহির্গত হইয়া কেবল পারদ পড়িয়া থাকে। লাবোয়াসিয়ে আরও বুঝিলেন যে বঙ্গ যখন মারিত হয় তখনও বায়ু হইতে এই উপাদান পৃথক হইয়া বঙ্গের সহিত মিলিত হয়। অপর পক্ষে মারণ প্রক্রিয়ার শেষে বায়ুর যে অন্যতর উপাদান অবশিষ্ট থাকে তাহাদ্বারা আর দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

এই পরীক্ষা দ্বারা আরও সপ্রমাণ হইল যে মরুৎ বা বায়ু একটী মূল পদার্থ নহে, পরন্তু উহাতে অন্ততঃ দুইটী বায়বীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে। লাবোয়াসিয়ের এই অপূর্ব্ব আবিষ্কার রসায়ন জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিল। ইহা দ্বারা আরবীয় ও ষ্টাল প্রমুখ রসায়নশাস্ত্রবিদগণের মতগুলি বিধ্বস্ত হইল; ফ্লজিষ্টনবাদিগণ তুমুল আন্দোলন করিলেও অবশেষে লাবোয়াসিয়ের মতই বলবৎ রহিল। বায়ুর এই নবাবিষ্কৃত উপাদান, যাহা ধাতু ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহার নাম হইল অম্লজান বা অক্‌সিজেন (oxygen)।

অম্লজান আবিষ্কার সম্বন্ধে নানা বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে এই প্রসঙ্গে প্রীষ্টলির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুইডেন দেশে শীলে (Scheele) নামক পণ্ডিত প্রীষ্টলির কিছু দিন পূর্ব্বে এই নূতন বায়ু আবিষ্কার করিয়াছিলেন ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু প্রীষ্টলি বা শীলে কেহই ইহার প্রকৃত গুণ বা তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারেন নাই। লাবোয়াসিয়ে কেবল ইহার প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া নব্যরসায়ন শাস্ত্রের জন্মদান করেন। ইনিই প্রথমে পরিমাণমূলক (quantitative) রসায়নশাস্ত্রের প্রচলন করেন।

পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিবেন যে লৌহাদি পুটপাক করিতে হইলে সরা ঢাকা না দিয়া আলগা রাখিলে শীঘ্রই ধাতু ভস্মাকারে পরিণত হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে প্রতি ৭ ভাগ ওজনের লৌহ ৩ ভাগ ওজনের অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া ১০ ভাগ ওজনের মণ্ডূরে পরিণত হয়। রসার্ণব তন্ত্রে পুটপাকের এই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় যথাঃ—

শ্রীভৈরব উবাচঃ—

স্থালিকায়াং নিধায়োর্দ্ধং স্থালীমন্যাং দৃঢ়াং কুরু
সন্ধিং বিলেপয়েৎ যত্নান্মৃদা বস্ত্রেন চৈব হি। *

যদি সরা আবদ্ধ রাখা যায় অর্থাৎ খোলা বা আল্‌গা না থাকে তাহা হইলে লৌহ কণিকাগুলি অতি অল্প পরিমাণে বায়ুর সংস্পর্শে আসিতে পারে; সুতরাং এই প্রক্রিয়া পুনঃপুনঃ সম্পাদন না করিলে লৌহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মে পরিণত হয় না। অম্লজানের সহিত লৌহের সংযোগই লৌহের মারণ—এই মূল তাৎপর্য্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে এত শ্রমসাধ্য শত বা সহস্র পুটের ব্যবস্থার প্রয়োজন হইত না.

বা ইহার স্বপক্ষে ওকালতি করিবারও আবশ্যক ছিলনা। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, যথাঃ—

"কিঞ্চ পুটবাহুল্যাং গুণাধিক্যায় ।
শতাদিস্তু সহস্রন্তু পুটো দেয়ো রসায়নে ।"

আবার প্রক্রিয়া সার্থক হইবে বলিয়া পূজাদিরও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এইত গেল পুটপাকের কথা। লাবোয়াসিয়ে সীসা ও রাঙ কাচপাত্রের ভিতর পুরিয়া পাত্রের মুখ উত্তাপ দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া অর্থাৎ গালাইয়া একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলেন এবং নিম্ন হইতে উত্তাপ প্রদান করেন। তিনি দেখিলেন ইহাতে ওজনের হ্রাস বৃদ্ধি (কমতি বা বাড়তি) হইল না; কিন্তু যেমন পাত্রের মুখ ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ফেলিলেন অমনি বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিয়া ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া ওজন বৃদ্ধি করিয়া দিল। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে এই সময়ের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৩০ খৃঃ অব্দে জাঁ রে (Jean Rey) নামক ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত বুঝিয়াছিলেন যে রাঙ ও সীসা বায়ুর সংস্পর্শে গলাইলে ক্রমশঃ ওজনে বাড়ে এবং তাহার কারণ এই দর্শাইয়াছিলেন যে যেমন বালুকারাশির উপর জল ঢালিয়া দিলে বালুকণাগুলি জল টানিয়া লয়, তেমনি ধাতুভস্মও বায়ুকণার সহিত সংলগ্ন হইয়া যায়। পাঠকগণ বুঝিবেন যে ইহাতে সত্যের কিঞ্চিৎ আভাষ আছে মাত্র। প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য আমরা মহানুভব লাবোয়াসিয়ের নিকটই ঋণী।

ধাতু ভস্ম হইবার সময় যে ওজনে বাড়ে বিখ্যাত রবার্ট বয়েল (Robert Boyle) এরও এরূপ ধারণা ছিল। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে উত্তাপ পাইলে ধাতুর পরমাণুগুলি অগ্নির পরমাণুর সহিত মিলিত হয়। অগ্নি বা তেজঃ পঞ্চ ভূতের অন্যতম,

অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ বিশেষ। এক পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত মিলিত হইলে যে মিশ্র পদার্থের ওজন বাড়িবে ইহার বিচিত্র কি? জগতে যত কিছু সত্য বা তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে তাহা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা হয় নাই। কত মেধাবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি নানাবিধ বিষয়ে ধ্যান ধারণা করিয়া গিয়াছেন। পরে যিনি যতটুকু আলো পাইয়াছেন তাহার সাহায্যে পথ দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এই প্রকারে ক্রমবিকাশ দ্বারা জগতে সকল বিষয়ের উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ যাহাকে আমরা "বাতাস" বলি তাহা অম্লজান (oxygen) ও যবক্ষারজান (nitrogen) এই দুই বায়বীয় পদার্থের (গ্যাসের) সংমিশ্রণ মাত্র*। যখন যশদ, সীসক প্রভৃতি ধাতু গলিত (তরল) অবস্থায় ক্রমাগত লৌহ দণ্ড দ্বারা মথিত হয় তখন তাহারা এই অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া ধাতু ভস্মে পরিণত হয়, এবং যখন অবরুদ্ধ বায়ুর মধ্যে পারদ ও অন্যান্য ধাতু উত্তপ্ত হয় (১১ পৃষ্ঠা দেখুন) তখন যে "বায়ু" অবশিষ্ট থাকে তাহাকে যবক্ষারজান বা নাইট্রোজেন কহে।

পারদ, রঙ্গ যশদ প্রভৃতি ধাতু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে 'দগ্ধ' হইলে কঠিন

* এতদ্ভিন্ন বাতাসে সর্ব্বদা জলীয় বাষ্প ও অম্লাঙ্গারক বায়ু (কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস) এবং সামান্য পরিমাণে আর্গণ (argon) নিয়ন (neon) জিনন (xenon) crypton (ক্রীপটন) আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় যবক্ষারজান নাম প্রথমে ব্যবহার করেন। ইহা অন্যার্থ বোধক। সোরার (nitre) কোন সংস্কৃত নাম পাওয়া যায় না। "History of Hindu Chemistry," Second ed. p. 182 দ্রষ্টব্য। সুতরাং নাইট্রোজেনের নূতন সংজ্ঞা দান করা দুরূহ। অতএব আমরা যবক্ষারজান কথাটাই ব্যবহার করিলাম।

পদার্থ (solid product) উৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি অঙ্গার কিম্বা গন্ধক দগ্ধ করা যায় তাহা হইলে বায়বীয় (gaseous) পদার্থের সৃষ্টি হয়; অঙ্গার ও গন্ধকের দহনে উৎপন্ন উভয় বায়ুই জলে দ্রবীভূত হয় এবং এই জলের অম্ল আস্বাদ ঘটে এই কারণে বাতাসের এই উপাদানকে লাবোয়া-সিয়ে অম্লজান নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। পরে দেখা যাইবে সোডিয়ম (sodium) পোটাসিয়ম (potassium) প্রভৃতি ধাতু অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার আস্বাদ অম্ল হওয়া দূরে থাকুক বরং ক্ষারের মত। সুতরাং বাতাসের এই উপাদানের 'অম্লজান' নামকরণ ঠিক হয় নাই।

বায়ুর স্বরূপ সম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিয়া লৌহ রঙ্গ প্রভৃতি ধাতু সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, বহুকাল হইতে একটা অমূলক ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে ধাতু যৌগিক পদার্থ অর্থাৎ "বায়ু, ক্ষিতি" ইত্যাদি – ভূত সমবায়ে উৎপন্ন। প্রায় দুই শত বৎসর হইল রসায়নবেত্তাগণ দেখিয়াছিলেন যে লৌহ গন্ধকদ্রাবকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে উভয়ের সংযোগে একপ্রকার বায়ু নির্গত হয়। এই কারণে ধাতু সম্বন্ধে উক্ত ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। অর্থাৎ লৌহ পঞ্চভূতসমষ্টি এবং তাহারই একটী ভূত উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা লৌহ হইতে বায়ুরূপে পরিত্যক্ত হয়। গন্ধকদ্রাবক পরিবর্ত্তে লবণদ্রাবকও ব্যবহৃত হইতে পারে। এই বায়ু কোন উপযুক্ত পাত্রে সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে দেখা যায় যে ইহা জ্বলিতে থাকে। এই কারণে উক্ত বায়ুকে "দাহ্য বায়ু" (inflammable air) নাম দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহার নাম উদজান বা হাইড্রোজেন (hydrogen)।

নিম্নে উপরোক্ত দাহ্য বায়ু অতি সহজে প্রস্তুত করিবার একটী যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হইল।
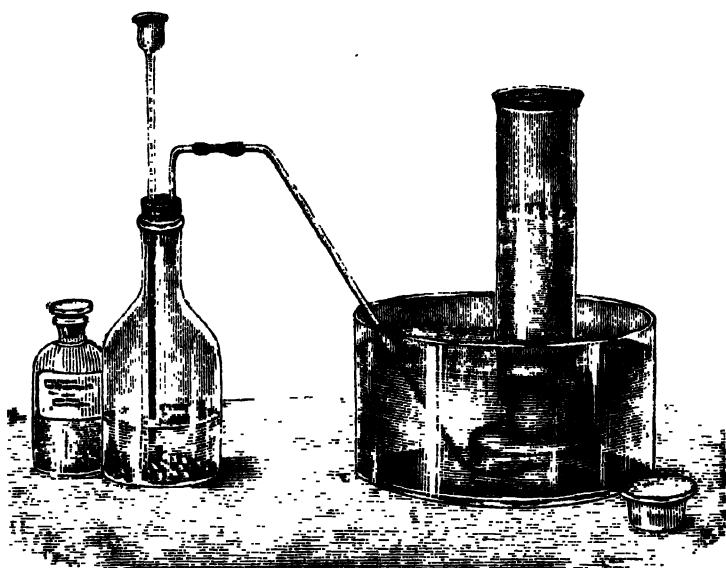
একটী কাচের বোতল লইয়া দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট একটী ছিপি (কর্ক) দিয়া উহার মুখ বন্ধ করুন। ঐ ছিপির একটী ছিদ্রের মধ্যে লম্বা সরু একটী কাচের নল বোতলের তলদেশ পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় ছিদ্রের ভিতর অপর একটী নল এক দিকে বোতলের মুখ পর্য্যন্ত এবং অন্য দিকে পার্শ্বের চিত্রানুরূপ বক্রভাবে একটী জল পূর্ণ পাত্রের ভিতর প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এখন বোতলের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ বা দস্তা খণ্ড দিতে হইবে। তার পর ফানেলের (funnel) এর ভিতর

দিয়া বোতলের মধ্যে কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত গন্ধকদ্রাবক ঢালিলেই দেখা যাইবে যে তাহা হইতে একপ্রকার বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। বোতলের গাত্র স্পর্শ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উষ্ণ বোধ হইবে। অর্থাৎ বোতলের ভিতর দস্তা বা লৌহের সহিত গন্ধকদ্রাবকের এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে বক্র নলের মুখ দিয়া পাত্রস্থিত জলের ভিতর হইতে এক প্রকার "বায়ু" বহির্গত হইতেছে। যে বায়ু প্রথম প্রথম বাহির হইয়া আসিবে, তাহা বিশুদ্ধ নয়। উহার সহিত সাধারণ বাতাস মিশ্রিত থাকে। বক্র নলের মুখ হইতে ঐ অবিশুদ্ধ বায়ু বাহির হইয়া বাতাসে মিলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেই সমুদয় মিশ্র বায়ু বাহির হইবে ও তখন বোতল হইতে যে বায়ু বাহির হইতে থাকিবে তাহা বিশুদ্ধ দাহ্য বায়ু, তাহাতে বাতাসের সংস্পর্শও থাকিবে না। এখন একটী স্তম্ভাকার জলপূর্ণ কাচপাত্র উপুড় করিয়া বক্রনলের মুখের উপর ধরিলে বিশুদ্ধ দাহ্য বায়ু জল ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে থাকিবে ও অল্পক্ষণেই স্তম্ভাকার পাত্রটি এই বায়ু ত পূর্ণ হইবে। তখন ঐ বায়ুপূর্ণ পাত্র জল হইতে বাহির করিয়া অগ্নি সংযোগ করিলেই উক্ত বায়ু জ্বলিতে থাকিবে। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে দস্তা ও গন্ধকদ্রাবকের রাসায়নিক সংযোগে এক প্রকার "দাহ্য" বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে। যদি অগ্নি সংযোগের সময় কোনরূপ শব্দ বা আওয়াজ শোনা যায় তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে সাধারণ বায়ু দাহ্য বায়ুর সহিত এখনও মিশ্রিত আছে; সুতরাং আর একটু অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া মতে 'দাহ্য বায়ু' সংগ্রহ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পরীক্ষা করা উচিত।

প্রীষ্টলি এই সময়ে কয়েকটী পরীক্ষা করেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইতেছে। তিনি একটী পাত্র কিয়দংশ জলে পূর্ণ করিয়া তাহার উপর একটী হাল্‌কা মুচি (crucible) ভাসাইয়া দিলেন। এবং মুচির মধ্যে কিঞ্চিৎ মেটেসিঁদুর রাখিয়া দিলেন। পরে একটী স্তম্ভাকৃতি কাচপাত্র (একমুখ বন্ধ অপর মুখ খোলা) পূর্ব্বোক্ত দাহ্য বায়ুতে পূর্ণ করিয়া জলের উপর স্থাপন করিলেন, অর্থাৎ মুচিস্থিত মেটে সিঁদুর দাহ্যবায়ুর মধ্যে জলের উপর ভাসিতে লাগিল। পরিশেষে আতস কাচের দ্বারা সূর্য্যরশ্মি ঘনীভূত করিয়া উহার উপর নিপাতিত করিলেন। তিনি বিস্ময় সহকারে দেখিতে লাগিলেন যে মেটে সিঁদুর উত্তপ্ত হইয়া পুনরায় সীসকাকারে (ধাতুরূপে) পরিণত এবং দাহ্য বায়ুও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে লাগিল। এদিকে স্তম্ভাকৃতি পাত্রের ভিতর জল উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ পাত্রটী জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং উক্ত দাহ্য বায়ু যে ধাতু হইতেই পরিত্যক্ত হয় এবং মারিত ধাতু বা ধাতুভস্মের সহিত উহা পুনর্ম্মিলিত হইলে ধাতু পুনর্জ্জীবিত হয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের এই অমূলক ধারণা উপরোক্ত পরীক্ষার ফলস্বরূপ আরও বলবতী হইয়া উঠিল। অর্থাৎ দাহ্য বায়ু যে ধাতুর একটী উপাদান বা অংশবিশেষ সে বিষয়ে তাঁহাদের বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হইল।

পাঠকগণ এখন বেশ বুঝিতে পারিবেন যে একেতো বহুদিনের সংস্কার সহজে অপনীত হয় না। তার পর আবার প্রমাণ হইল যে দাহ্যবায়ু ধাতুর একটী উপাদান, সুতরাং ধাতু যে মৌলিক পদার্থ নয় সে বিষয়ে তখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। প্রীষ্টলি পূর্ব্বমত আর একটী পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এবার মেটেসিঁদুরের পরিবর্ত্তে

পূর্ব্বোক্ত রক্তবর্ণ পারদভস্ম লইয়া জলের পরিবর্ত্তে পারদের উপর দাহ্যবায়ুর মধ্যে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বমত উত্তপ্ত করেন। পরে দেখিতে পান যে পাত্রের গাত্রে কিছু কিছু জলকণা আবির্ভূত হইয়াছে কিন্তু তিনি ইহার কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। যখন মানুষ একটা ভ্রমে অন্ধ হয়, তখন স্পষ্ট জিনিষও দেখিতে পায় না।

প্রীষ্টলিও সেইরূপ পূর্ব্বপ্রচলিত মতের বশবর্ত্তী হইয়া এই জল-বিন্দুর উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে হয়ত রক্তবর্ণ ভস্ম অথবা দাহ্য বায়ুর মধ্যে জলীয় অংশ অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করিতেছিল। প্রীষ্টাল আরও দেখিয়াছিলেন যে একটী কাচ পাত্রের মধ্যে সাধারণ বায়ু ও 'দাহ্যবায়ু' মিশ্রিত করিয়া যদি তড়িৎস্ফুলিঙ্গ চালান যায় তবে ভীষণ আওয়াজ হইয়া পাত্রের নির্ম্মল শুষ্ক গাত্রে কিছু কিছু জলকণাও দেখা যায়। এই শেষোক্ত পরীক্ষা করিয়া তিনি অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপিও এই সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ অন্ধ থাকিলেন। এই সময়ে কাবেণ্ডিস (Cavendish) আসিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। প্রীষ্ট-লির উপরোক্ত পরীক্ষাগুলির মধ্যে বিশেষ সত্য নিহিত থাকিতে পারে ক্যাবেণ্ডিসের এই ধারণা হওয়ায় তিনি সমধিক আগ্রহের সহিত এ সম্বন্ধে পুনঃ পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নানারূপ পরীক্ষার ফলে দেখিলেন যে 'দাহ্য' বায়ু ও সাধারণ বায়ু বা বাতাস মিশ্রিত করিয়া তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ করিলে সাধারণ বায়ুর এক পঞ্চমাংশের ও তাহার দ্বিগুণ মাপ বা আয়তনের দাহ্য বায়ুর রূপান্তর হইয়া সেই অংশ জলরূপে পরিণত হয় এবং উহা পাত্রের গাত্রে শিশির কণারূপে প্রতীয়মান হয়। তিনি

অবশেষে সাধারণ বায়ুর পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ অম্লজান বায়ু লইয়া নিম্ন প্রদর্শিত যন্ত্রের দ্বারা এই বিষয়ে বিশেষ রূপ পরীক্ষা করেন।

ক একটী কাচের গোলক। উহার মুখে একটী কাচের ছিপির ভিতর তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ করিবার জন্য দুইটী তাম্রের তার প এবং নিম্নেও একটী পিতলের ছিপি (stopcock) খ থাকিবে।

ঘ আর একটী ঘণ্টাকৃতি বড় কাচ পাত্র, উহা পারদ পূর্ণ দ্বিতীয় পাত্রের উপর ন্যস্ত আছে। ঘ পাত্রের উপরের মুখেও একটি পিতলের ছিপি বা stopcock গ এবং উহার নিম্ন মুখ খোলা ও পারদের ভিতর নিমগ্ন থাকিবে। প্রথমে ঘ পাত্রটী এক মাপ আয়তনের অম্লজান এবং দুই মাপ দাহ্য বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। ঐ মিশ্র বায়ু পূর্ব্বোক্ত দাহ্য বায়ু সংগ্রহের ন্যায় ঘ পাত্রে প্রবেশ করিবে। (১৭ পৃঃ দেখুন।)

তার পর ক কাচের গোলকের খ ছিপিটী খুলিয়া দিয়া বায়ু নিষ্কাশণ যন্ত্রের সহিত যোগ করিলে উহার আভ্যন্তরীন বাতাস সমস্ত নিষ্কাশিত হইবে। তখন ঐ ছিপি বন্ধ করিয়া উক্ত মিশ্রবায়ুপূর্ণ ঘ পাত্রের
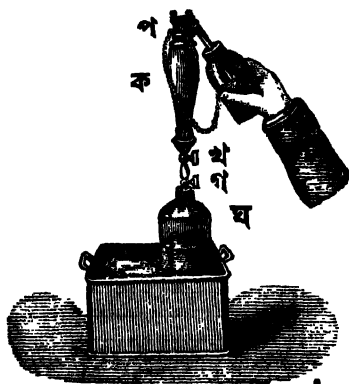
সহিত উহাকে একটি রবারের নলদ্বারা সংযুক্ত করিতে হইবে। পরে উভয় ছিপি (stopcock) খ ও গ খুলিয়া দিলে মিশ্র বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া কাচের গোলকটীর ভিতর প্রবেশ করিবে। তখন গোলকের খ ছিপিটী পুনর্ব্বার বন্ধ করিয়া উপরিস্থিত প তাম্র তারের

দ্বারা তড়িৎস্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ করিলে ভীষণ আওয়াজ সহ গোলকপূর্ণ মিশ্র বায়ুর মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইবে। আরও দেখা যাইবে যে গোলকের নির্ম্মল শুষ্ক গাত্রে শিশির বিন্দুবৎ জলীয় পদার্থ আবির্ভূত হইয়াছে। তখন খ ও গ ছিপি দুইটি খুলিয়া দিলে গোলকটী পুনর্ব্বার উক্ত মিশ্র বায়ুপূর্ণ হইবে। আবার খ ছিপিটী বদ্ধ করিয়া তড়িৎ সংযোগ করিলে পূর্ব্ববৎ বৈদ্যুতিক শিখা সহ রাসায়নিক ক্রিয়া হইবে। এই রূপে বারম্বার এই প্রক্রিয়া সাধিত হইলেই দেখা যাইবে যে প্রতিবারেই গোলকের ভিতর মিশ্র বায়ুর মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ হইতেছে এবং শেষে স্পষ্ট জল বিন্দু প্রকাশ হইবে। মিশ্র বায়ুর মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া উহাদের বায়বীয়ত্ব লুপ্ত না হইলে অর্থাৎ গোলকের মধ্যে বায়ুর অভাব না হইলে দ্বিতীয় বারের মিশ্র বায়ু আপনা হইতে কখনও গোলকের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না।

উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারা কাবেণ্ডিস প্রতিপন্ন করিলেন যে বিশুদ্ধ দাহ্যবায়ু ও অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা আর কিছু নয় কেবল বিশুদ্ধ জল। এই আবিষ্কার নব্য রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তির একটা প্রধান কারণ। ২৫০০ বৎসর ধরিয়া গ্রীক ও হিন্দু দার্শনিকগণ যে মত অপ্রতিহত ভাবে প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন তাহা এত দিনে বিধ্বস্ত হইল; উহা অসার ও অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং জল যে মৌলিক পদার্থ নয় বরং যৌগিক পদার্থ সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। এবং দুই ভাগ আয়তনের দাহ্য বায়ু ও এক ভাগ আয়তনের অম্লজান এই দুইটী অদৃশ্য বায়ুর সংযোগে জলের উৎপত্তি তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইল। দুই বা ততোঽধিক মৌলিক পদার্থের সংযোগে কৃত্রিম উপায়ে

কোন যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি বা সৃজনকে সংশ্লেষণ কহে। আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কোন যৌগিক পদার্থকে ভাঙ্গিয়া মূল পদার্থ বাহির করাকে বিশ্লেষণ কহে। যদিও কাবেণ্ডিস পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা জলের উৎপত্তি বা স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার লেখনি প্রসূত গ্রন্থাদিপাঠে বোধ হয় যে জল সম্পূর্ণ যৌগিক পদার্থ এ বিষয়ে তাঁহার স্পষ্ট ধারণা এবং দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই। সেই বৎসরেই অর্থাৎ ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ফরাসী দেশে লাবোয়াসিয়ে ও লাপ্লাস নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় কাবেণ্ডিসের পরীক্ষার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। একমাত্র লাবোয়াসিয়েই যে এই বিষয়ের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তিনি কাবেণ্ডিস ও প্রিষ্টলীর পরীক্ষাগুলি সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া স্বকীয় পরীক্ষাদ্বারা স্পষ্ট-প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে জল যৌগিকপদার্থ এবং দুই ভাগ আয়তনের "দাহ্য" বায়ু বা উদ্-জান ও একভাগ আয়তনের অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন।

জল যে যৌগিকপদার্থ এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তা কে? এই প্রশ্ন লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ রসায়নবেত্তা-গণ স্বদেশ প্রেমে উত্তেজিত হইয়া স্বজাতির গৌরবরক্ষা করিতে যেমন প্রয়াস পাইয়াছিলেন তদ্রূপ ফরাসীদেশীয় মহানুভব রসায়নবেত্তাই যে এই গৌরব ও সম্মানের একমাত্র অধিকারী তাহা প্রমাণ করিতে তদ্দেশবাসীগণ ও বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, যে সময় লাবোয়াসিয়ে রঙ্গভস্ম লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন (১১—১৪পৃঃ) ঠিক সেই সময়েই এমন কি সেই

বৎসরেই প্রিষ্টলীও রক্তবর্ণ পারদভস্ম হইতে অম্লজান বায়ু বাহির করেন, কিন্তু প্রিষ্টলী কেবল অম্লজান আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা বা তৎসম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করেন নাই। বরং তিনি পূর্ব্বাপর প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন নাই। কেবল মাত্র লাবোয়াসিয়েই এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জগতে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জলের যৌগিকত্ব সম্বন্ধেও তুমুল বিতণ্ডা হইয়াছিল। প্রিষ্টলী ও কাবেণ্ডিস উভয়েই পূর্ব্বসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধের ন্যায় হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন—প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম হন নাই।

পাঠক ইহাতে এমন বুঝিবেন না যে লাবোয়াসিয়ে কেবল পরের আবিষ্কৃত বিষয়গুলি আত্মসাৎ করিয়া গাঁথিয়া জুড়িয়া নব্য রসায়নের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ ধীসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং কোন বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সে সময়ে বিজ্ঞান জগতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না।

স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে স্বকৃত পরীক্ষাগুলির মর্ম্ম বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনিই নব্য রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কাবেণ্ডিস ও প্রিষ্টলী পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ নূতন নূতন পরীক্ষা সত্ত্বেও কেবল উহাদের প্রকৃত মর্ম্ম পরিগ্রহের অভাবে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ফ্লজিষ্টন বাদী ছিলেন। তাঁহাদের ভ্রম দূর হয় নাই। আবার নব্য রসায়ন মন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ 'জড়পদার্থের অনশ্বরত্ব' অর্থাৎ পরমাণুর ধ্বংস বা হ্রাস বৃদ্ধি নাই এই মত মহাত্মা লাবোয়াসিয়েই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে বহু প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু দার্শনিকগণের মধ্যেও এই মত অনেকটা প্রচলিত ছিল এবং

তাঁহাদের গ্রন্থেও ইহার আভাস পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের বিশেষ আলোচনা বা বিকাশ হয় নাই। সুতরাং লাবোয়াসিয়েকেই এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত প্রচারকর্ত্তা এবং নব্য রসায়নের "জন্মদাতা" স্বীকার করিতে হইবে।

১৭৯৪ খৃঃ অব্দে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই মনস্বী ব্যক্তি গিলোটিন নামক বধযন্ত্রে প্রাণ হারান। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বিপ্লবকারিগণ নব্য রসায়নের জন্মদাতা এই মহা পুরুষেরও প্রাণ দণ্ড না করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। বিচারপতি কফিনলের নিকট যখন আবেদন হইল যে অন্ততঃ সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলিয়া লাবোয়াসিয়ের প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হউক তখন তিনি পিশাচের ন্যায় কর্কশভাবে উত্তর দিয়াছিলেন যে পণ্ডিত বলিয়া উহার বিচারকালে ন্যায়ের অপলাপ হইতে পারে না। প্রচলিত সাধারণতন্ত্রের জন্য পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিকের কোন প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

ধাতুর মারণ ও পুনর্জ্জীবিত করণ—১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ধাতু মারিত হইলে ইহার ধাতব গুণ—অর্থাৎ ভাস্বরতা, কাঠিন্য, নমনীয়তা প্রভৃতি অন্তর্হিত হয়; মারিত ধাতু সামান্য হাতুড়ির আঘাত পাইলেই গুঁড়া হইয়া যায়। মারিত ধাতুকে আবার পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে তৈল, ঘৃত, লাক্ষা ও সোহাগার সহিত মিশ্রিত করিয়া মুষার মধ্যে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিতে হইবে এবং অগ্নিতে

রাখিয়া ক্রমান্বয়ে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। শীতল হইলে মুষার মুখ খুলিলে দেখা যাইবে যে মারিত ধাতু পুনর্ব্বার ধাতু রূপে পরিণত অর্থাৎ স্বধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। তৈল, ঘৃত, লাক্ষা প্রভৃতি পদার্থের প্রধান উপাদান অঙ্গার; আবদ্ধ অবস্থায় উত্তাপ পাইলে উহারা অঙ্গারে পরিণত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কোন মূল ধাতু অম্লজান বায়ুর সহিত মিলিত হইলে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই মারিত বা দগ্ধ ধাতু অর্থাৎ মূল ধাতু+অম্লজান=দগ্ধ ধাতু। এখন স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে উত্তাপ সহকারে অঙ্গার দগ্ধ বা মারিত ধাতু হইতে অম্ল-জান অপসারিত করিয়া স্বয়ং অঙ্গারাম্ল বায়ু রূপে (কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস) পরিণত হয় এবং ধাতুও পুনর্ব্বার স্বগুণ প্রাপ্ত অর্থাৎ পুনর্জ্জীবিত বা উত্থাপিত হয়।*

দগ্ধ ধাতু (মূল ধাতু+অম্লজান)+অঙ্গার=মূল ধাতু
(পুনর্জ্জীবিত)+অঙ্গারাম্ল (অঙ্গার+অম্লজান)।

এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে মারিত ধাতু এই শব্দ যে কেবল দগ্ধ ধাতু বা অম্লজানযুক্ত ধাতুর উপর প্রয়োগ হয় তাহা নয়। অনেক সময় গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধাতুকে উত্তপ্ত করা হয়। তান্ত্রিক মতে প্রস্তুত তাম্র ও পারদ ঘটিত ঔষধ প্রায়ই গন্ধকিত বা গন্ধক যুক্ত (sulphide)। এবং উহাতে অম্লজানের অভাব দৃষ্ট হয়।

-:o:-

* মৃতস্য পুনরুদ্ভূতি প্রোক্তোত্থাপনাখ্যয়া।
ইতি রসরত্নসমুচ্চয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

কণাদমুনি, জন ডালটন ও পরমাণুবাদ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে পদার্থ অনশ্বর ও পরমাণুসমষ্টি দ্বারা গঠিত এই মত চলিয়া আসিতেছে। মহর্ষি কপিল বলেন, "নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধি" অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত বস্তু না থাকিলে আপন হইতে বা স্বতঃ কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। বৈশেষিক দর্শনেও এই মতের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। কণাদ মুনি বলেন--জল, বায়ু, মৃত্তিকা, তেজঃ এই চারি প্রকার জড় পদার্থের পরমাণু মাত্রই নিত্য, আর পরমাণুসমষ্টিস্বরূপ ঘটপটাদি সাবয়ব দ্রব্য অনিত্য। আমাদের দেহও প্রকৃত পক্ষে নশ্বর নয়। মৃত্যুর পর যে পঞ্চভূতের সমবায়ে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই পঞ্চভূতে পুনর্ব্বার লীন হয় অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। বৈশেষিক দর্শনের অনেক পূর্ব্বেও এই মতের আভাষ পাওয়া যায়। বৃহদা-রণ্যক উপনিষদে জানা যায় যে মৃত্যুর পর দেহ মৃত্তিকাতে লীন হয়।

কণাদ মতে অদৃষ্ট অর্থাৎ অজ্ঞাত কারণ বিশেষ দ্বারা উল্লি-খিত পরমাণু সমূহের সংযোগে বিশ্ব সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। দুই পার্থিব পরমাণু সংযুক্ত হইয়া এক দ্ব্যণুক হয়। তিন দ্ব্যণুকে এক ত্রসরেণু হয়। এইরূপ উত্তরোত্তর স্থূলতর অবয়ব উৎপন্ন হইয়া অবশেষে সমুদায় পার্থিব পদার্থ গঠিত হয়। গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও এই

প্রকার মত প্রকীর্ত্তিত হইয়াছিল তবে সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে ভারতে এই মত অনেক পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

"অন্যান্য দর্শনকার অপেক্ষা কণাদের জড় পদার্থের জ্ঞানানুশীলনে সমধিক প্রবৃত্তি জন্মে দেখা যাইতেছে। তিনি পরমাণুবাদ সংস্থাপন করিয়া সে বিষয়ের সূত্রপাত করেন। মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, বৃক্ষের রস-সঞ্চরণ, করকা ও হিমশিলা, চুম্বক ও চৌম্বকাকর্ষণ, জড়ের সংযোগবিভাগাদি গুণ ও গত্যাদি ক্রিয়া প্রভৃতি নানা ব্যাপারে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সূত্রপাতেই অবশেষ হইল। অঙ্কুর রোপিত হইল, কিন্তু বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইল না। উহা সংস্কৃত, পরিবর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া ফল-পুষ্প-শোভায় সুশোভিত করা ভারতভূমির ভাগ্যে ঘটিল না। কালক্রমে সে সৌভাগ্য বেকন্, কোম্ত ও হম্বোলটের জন্মভূমিতে গিয়া প্রকাশিত ও প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল।" (অক্ষয় কুমার দত্ত)

পরমাণু নিত্য আবার অবিভাজ্য। এক টুকরা গন্ধক লইয়া শিলার উপর জলে ঘসিলে অতি কোমলচূর্ণে পরিণত হয়। এই চূর্ণ এত সূক্ষ্ম যে শুকাইলে উড়িয়া যায় এবং দুই অঙ্গুলির মধ্যে রাখিয়া নাড়িলে অতি মোলায়েম ঠেকে। একটুকু এই গুঁড়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে বড় বড় কণিকা সমষ্টির মত প্রতীয়মান হইবে। তাহার কারণ যে সমস্ত রেণু স্থূল দৃষ্টিতে অতি সূক্ষ্ম বোধ হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাহা অনেক বড় দেখায়।

এখন কথা হইতেছে যদি কোন পদার্থকে ক্রমাগ্বয়ে এই প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত করা যায় তবে কোথায় তাহার শেষ হইবে?

সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম হইলেও অবশেষে ইহার চরম সীমা পাওয়া যাইবে। পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে যখন পদার্থ মাত্রেরই কণিকা অবিভাজ্য হইয়া যায়; এই অবিভাজ্য কণিকাই পরমাণু।

আর একটা কথা উঠিতেছে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে রস ও গন্ধক সম্ভূত হিঙ্গুল। পারা আর গন্ধক একত্র খলে মাড়িলে প্রথমতঃ কৃষ্ণবর্ণ ধূলিবৎ এক প্রকার নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয়। আয়ুর্ব্বেদে ইহা কজ্জলী নামে অভিহিত। পারদ তরল পদার্থ আর গন্ধক কঠিন। কিন্তু একত্র মিশ্রিত হইলে উভয়ের পরমাণু পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া তন্মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই কৃষ্ণবর্ণ নূতন পদার্থ পারদও নয় গন্ধকও নয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে এক ভাগ বা আয়তনের অম্লজান ও দুই ভাগ বা আয়তনের উদজান* এই দুই অদৃশ্য বায়ু তড়িৎস্ফুলিঙ্গের সংযোগে মিলিত হইয়া জল উৎপাদন করে। এখন কথা হইতেছে গন্ধক ও পারা যে কোন ওজনে লইয়া যোগ করিলে কজ্জলী হইবে কি? চক্রদত্ত বলেন ইহাদিগকে সমান ভাগে লইতে হইবে†। বাস্তবিক আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত কজ্জলী বা রসপর্প্পটী পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহাতে অনেক গন্ধক কণিকা পারদের সহিত

* অথবা ৮ ভাগ ওজনের অম্লজান এক ভাগ ওজনের উদজান।

† ——শুদ্ধৌ সমানৌ রসগন্ধকৌ
সম্মর্দ্য কজ্জলাভন্তু কুর্য্যাৎপাত্রে দৃঢ়াশ্রয়ে।
* * * * *
রসপর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা

অন্যস্থানে চক্রপাণি বলেনঃ—

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষৌ প্রত্যেকং গ্রাহ্যমেকতঃ
তন্মর্দ্দনাচ্ছিলাখল্লে যত্নতঃ কজ্জলীকৃতম্।

যুক্ত না হইয়া অযুক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইউরোপে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এই বিষয়ে ঘোর বাদানুবাদ চলিয়াছিল। এক পক্ষ বলেন যে দুই মৌলিক পদার্থ যে কোন ভাগে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া নূতন যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে অপর পক্ষও দৃঢ়তার সহিত পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করেন যে তাহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মত (অনুপাত অনুসারে) মিলিত হয়। এমন সময়ে জন ডাল্‌টন (John Dalton) আবির্ভূত হইলেন। লাবোয়াসিয়ের সময় হইতে প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া রাসায়নিকগণ অনেক যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। ডালটন স্বয়ংও অনেকগুলি যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিয়া পরীক্ষা করেন।

তিনি মৌলিক পদার্থের সংযোগ ও যৌগিক পদার্থের বিয়োগের ভিতর একটা সুন্দর নিয়ম নিহিত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। দুই একটী উদাহরণ দিলে উহা পাঠকবর্গের সহজে বোধগম্য হইবে। ইতিপূর্ব্বে রঙ্গভস্মের উল্লেখ করা গিয়াছে; প্রস্তুত প্রণালী ভেদে দুই প্রকার রঙ্গভস্ম পাওয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমানিত হইয়াছে যে এক প্রকার ভস্মে ১৫ ভাগ ওজনে রাঙের সহিত দুই ভাগ ওজনে অম্লজান বায়ু সংযুক্ত হয়। আবার ঠিক সেই ১৫ ভাগ ওজনের রাঙের সহিত ৪ ভাগ ওজনে অম্লজান বায়ু সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় প্রকার ভস্ম উৎপন্ন হয়। কয়লা খোলা বাতাসে পুড়িলে এক রকম বায়ু জন্মে, তাহাতে অম্লজানের ভাগ অধিক থাকে, উহার নাম অঙ্গারকাম্ল—আর কয়লা অল্প বাতাসে পুড়িলে আর এক রকম বায়ু জন্মে; উহা বড়ই বিসাক্ত, উহাতে অম্লজানের ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এই বিষাক্ত

বায়ুতে ৩ ভাগ ওজনে কয়লার সহিত ৪ ভাগ ওজনে অম্লজান সংযুক্ত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গারকাম্প বায়ুতে সেই ঠিক ৩ ভাগ ওজনের কয়লার সহিত ৮ ভাগ অর্থাৎ দ্বিগুণ ওজনে অম্লজান মিলিত হয়। এই সকল বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া ডাল্টন হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে রাসায়নিক সংযোগ কোন প্রকার 'খামখেয়ালি' (capricions) নিয়মে সংঘটিত হয় না এবং এই 'নির্দ্দিষ্ট' নিয়মের পরিপোষণার্থ তিনি নিম্নলিখিত সূত্রগুলি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে অবিভাজ্য পরমাণুর কথা বলা হইয়াছে। যত প্রকার 'ভূত' বা মৌলিক পদার্থ আছে তাহাদের প্রত্যেকের পরমাণুর ওজন বিভিন্ন। এবং যেহেতু দুই বা ততোধিক মৌলিক পরমাণুর পরস্পর মিশ্রণ বা পাশাপাশি অবস্থান বশতঃ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পরমাণুও অবিভাজ্য সুতরাং ওজন ঘটিত একটী নির্দ্দিষ্ট অনুপাত ভিন্ন উহাদের সংযোগ হইতে পারে না।

মনে করুন রাঙের প্রত্যেক পরমাণুর ওজন ১৫ রতি ও অম্লজানের প্রত্যেক পরমাণুর ওজন ২ রতি তাহা হইলে রাঙের এক পরমাণু ও অম্লজানের এক পরমাণুর যোগ ঘটিলে ১৫ রতি রাঙের সহিত ২ রতি অম্লজান মিলিত হইয়া ১৭ রতি রঙ্গভস্ম উৎপন্ন হইবে।* কিন্তু এই দুই "ভূতের" সংযোগে আবার অপর একটী ভস্ম প্রস্তুত হয় তাহাতে ১৫ রতি রাঙ্গের সহিত ঠিক ৪ রতি অর্থাৎ পূর্ব্বের দ্বিগুণ ওজনে অম্লজান মিলিত হইয়া ১৯ রতি রঙ্গভস্ম (দ্বিতীয় প্রকার) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে বুঝিতে হইবে রাঙ্গের এক পরমাণুর

* এখানে 'আপেক্ষিক গুরুত্ব" লওয়া হইতেছে। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতম একটী পদার্থের ওজনের সহিত তুলনায় অন্যান্য পদার্থের ওজন লওয়া হইতেছে। বস্তুতঃ পদার্থের প্রকৃত ওজন (absolute weight) আমরা জানিনা।

সহিত অম্লজানের দুইটী পরমাণু যুক্ত হইয়াছে। এই রূপ ১৪ ভাগ যবক্ষারজানের সহিত ৮, ১৬, ২৪, ৩২, অথবা ৪০ ভাগ ওজনে অম্লজান মিলিত হইয়া পঞ্চবিধ নূতন বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্য কোনরূপ মাঝামাঝি ভগ্নাংশ ঘটিত অনুপাত অনুসারে সংযোগ হওয়া অসম্ভব। পরমাণু ভাঙ্গিতে পারিলে তাহা সম্ভব হইত। মনে করুন বিভিন্ন প্রকার পরমাণুকে আমরা ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাকার সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিলাম। কিন্তু যেহেতু আমাদের পূর্ব্ব সূত্রানুসারে পরমাণু অবিভাজ্য তাহা হইলে ক ও খ সংযোগে ক+খ, ক+২খ, ক+৩খ, ক+৪খ, ২ক+খ ইত্যাকার যৌগিক পদার্থ নির্দ্দিষ্ট গুণানুপাত অনুসারে উৎপন্ন হইতে পারে।

ক+½খ এরূপ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। আর একটু প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক। পুরাকাল হইতেই পরমাণুবাদ ষড়দর্শনের এক অঙ্গস্বরূপ ধার্য্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এত দিন ধরিয়া ইহা বা এই অনুমান (hypothesis) কেবল গুণজ্ঞাপক (qualitative) ছিল মাত্র অর্থাৎ দুই বা ততোঽধিক ভূতসমবায়ে যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হয়। ডাল্টন ইহা মানিয়া লইলেন কিন্তু এই বিষয়কে পরিমাণজ্ঞাপক (quantitative) নির্দ্দিষ্ট নিয়মভুক্ত করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিয়া আরও পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিলেন।

সচরাচর আমরা কোন বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটন বা কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তৎসংক্রান্ত বিবিধ ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে স্বতঃই নানারূপ অনুমান করিয়া থাকি। এই অনুমান সাহায্যে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষরূপে কারণ নির্দ্দেশ হইলে অনুমান ক্রমশঃ সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু তৎপরে আবার নূতন নূতন ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ কালীন উক্ত অনুমান দ্বারা সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে উহা

অমূলক প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে তখন আর সত্য বলিয়া আদরণীয় হয় না। যেমন সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে সাধারণতঃ ধারণা ছিল যে গ্রহণের সময় সূর্য্য ও চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিতে উদ্যত হয় এবং ভূমি কম্প সম্বন্ধেও এ দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে অনন্তনাগ পৃথিবীর ভার বহনে ক্লান্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়া দিলেই ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য জগতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল অমূলক ধারণা তিরোহিত হইতেছে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বেশ জানেন যে চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্যবর্ত্তী হইলে অর্থাৎ চন্দ্রের ছায়া সূর্য্যের উপর পড়িলে সূর্য্যগ্রহণ হয় এবং চন্দ্র সরিয়া যাইলেই গ্রহণের মোক্ষ হয়। এখন আর গ্রহণ কালীন চন্দ্র ও সূর্য্যকে রাহুগ্রস্ত বলিয়া কেহ বিশ্বাস করেন না। রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত গবেষণা দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে নির্দ্দিষ্টানুপাতিক নিয়মটী নব্য রসায়ণের ভিত্তিমূলে দৃঢ়রূপে নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টানুপাতিক নিয়মের কদাচ উল্লঙ্ঘন হইতে পারে না। কবির বাক্য এই স্থলে প্রয়োগ করা যায়।

রেখা মাত্রমপি * * * ন ব্যতীয়ু নির্মস্তনে মিবৃত্তয়ঃ।

এখন আমাদের আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত কতিপয় "কবিরাজী" ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। যথা কজ্জলী, স্বর্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজ। পারদ ও গন্ধক সংযোগে হিঙ্গুল প্রস্তুত হয়। এই হিঙ্গুল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহা ২৫ ভাগ পারদ ও দুই ভাগ গন্ধক এই দুই উপাদান হইতে প্রস্তুত অর্থাৎ ২৭ রতি হিঙ্গুলে ২৫ রতি পারদ ও ২ রতি গন্ধক বিদ্যমান থাকে। এই অনুপাতের কুত্রাপি ব্যতিক্রম হয় না। পাঠক এখন বুঝিবেন যে কেন চক্রপাণি মতে প্রস্তুত কজ্জ-

লীতে অতিরিক্ত গন্ধক অসংযুক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। এই কজ্জলী আবার "পাক" করিলে হিঙ্গুলে পরিণত হয়। কজ্জলী কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ, কিন্তু হিঙ্গুল "দানাদার" বিশেষ। প্রক্রিয়া বিশেষে উহার দানা-গুলি বাস্তবিক তালের চোঁচের ন্যায় পাওয়া যায় এই জন্য "তালচোঁচ" হিঙ্গুল বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিত। এখন একবার স্বর্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। রসেন্দ্র-চিন্তামণি নামক প্রাচীন ও প্রামাণিক তান্ত্রিক গ্রন্থে কথিত আছে "শোধিত মৃদু সোণারপাত ১ পল, শোধিত পারদ ৮ পল একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক, তাহার সহিত শোধিত গন্ধক ১৬ পল মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী কর। তদনন্তর রক্তকার্পাসপুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দাও এবং শুষ্ক করিয়া দৃঢ় কাচকূপীর মধ্যে ভর। পরে কূপীর মুখ এক খণ্ড খড়ীর দ্বারা রুদ্ধ কর এবং সেই কূপী একটা হাড়ির ভিতর রাখিয়া হাড়িকে বালুকাদ্বারা এরূপ পূর্ণ কর যে, কূপীর গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ হয়। পরে ৩ দিন জ্বাল দাও। জাল দিতে দিতে যখন রক্তবর্ণ ঔষধ কূপীর গলায় লাগিবে, তখন তাহা বহিষ্কৃত করিয়া লও।*

কাচকূপীর পরিবর্ত্তে সচরাচর বোতল ব্যবহৃত হয়। বোতলটা সর্ব্বাগ্রে পাঁচবার 'পুরু' কাপড় ও কাদার প্রলেপ দিয়া শুকাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে আর 'ফেটে চোটে' যায় না। এই প্রক্রিয়া সম্যকরূপ বুঝিতে হইলে বাহিরের ২।৪টা দৃষ্টান্ত লইয়া একটুকু অন্য আলোচনা করা প্রয়োজন। দুই বা ততোঽধিক পদার্থ একত্র থাকিলে

---

* পলং মৃদুস্বর্ণদলং রসেন্দ্রং পলাষ্টকং ষোড়শ গন্ধকস্য।
শোণৈঃ সুকার্পাসভবপ্রসূনৈঃ, সর্ব্বং বিমর্দ্যাথ কুমারিকাদ্ভিঃ।
তৎকাচকুম্ভে নিহিতং সুগাঢ়ে মৃৎকর্পটৈস্তদ্দিবসত্রয়ঞ্চ।
পচেৎ ক্রমাগ্নৌ সিকতাখ্যযন্ত্রে ততোরজঃ পল্লবরাগরম্যম্।
—রসেন্দ্রচিন্তামণি।

তাহাদিগকে পরস্পর পৃথক করিবার জন্য প্রকারভেদে (উহাদের প্রকৃতি বা গুণানুসারে) নানা রকম উপায় অবলম্বিত হয়। ধান হইতে চাউল বাহির করিবার সময় কি উপায়ে তুঁষ পৃথক করা হয় তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। আবার চাউলের সঙ্গে যদি বেশী গুঁড়া থাকে তাহাও পৃথক করিবার অতি সহজ উপায় আছে। কলিকাতার রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায় যে মুদী পসারিগণ একটী ধামা মাটিতে রাখিয়া অপর একটী ধামার চাউল একটু উচ্চ হইতে উহার ভিতর ঢালিতে থাকে তাহাতে বাতাসে গুঁড়া উড়িয়া যায়। এ ত গেল সহজ উপায়। মনে করুন চিনির সহিত অধিক পরিমাণে ধুলা মাটী মিশ্রিত আছে। এবার একটু মুষকিল—ধুলাও ভারি চিনিও ভারি, এবার কুলার সাহায্যে চলিবে না। অন্য 'ফিকির' চাই। এই অপরিষ্কার চিনি উপযুক্ত পরিমাণে জলে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং একটি কাটি দ্বারা ভালরূপ নাড়াচাড়া করিতে হইবে। চিনি জলে সম্পূর্ণরূপ গলিয়া যাইবে এবং আশু বোধ হইবে যে ধুলা মাটি ও ঐ সঙ্গে গলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা নয়। ধুলার অতি সূক্ষ্ম কণিকাগুলি জলে ভাসমান (suspended) থাকিবে। এক দিন পরে যখন এই জল "থিতিয়াছে", তখন দেখিবেন যে পাত্রের নীচে মাটীর স্তর পড়িয়াছে। আস্তে আস্তে উপরের পরিষ্কার জল অপর একটী পাত্রে ঢালিয়া লইতে হইবে।* অনেক স্থলে ব্যবসায়িগণ ক্যাম্বিস কাপড়ের ছাক্‌নী করিয়া ছাকিয়া লয়েন।

এই পরিষ্কার জল মৃদু তাপে (জালে) শুকাইলে চিনি পুনর্ব্বার

* বর্ষাকালে যখন গঙ্গায় "ঢল" নামে—গৃহস্থগণ এই অপরিষ্কার জল কলসীতে এক দিন যাবৎ একটু ফিটকিরি বা নির্ম্মল দিয়া রাখিয়া দেন। জল এই প্রকারে থিতিলে ময়লা মাটী পাত্রের নীচে জমে।

দানার আকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন একবার মনে করুন রুশিয়ার বড় বড় রণতরী উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) ঘুরিয়া জাপান সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, মধ্যে কোন বন্দরে জাহাজ লাগাইবার আদেশ নাই।* উহাদের পানীয় জল শেষ হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের জল যেমন লবণাক্ত তেমনি তিক্ত বিশেষতঃ পান করিলে ভেদ বমি হয়। এখন এই সহস্র সহস্র নাবিক ও যোদ্ধাগণ কি জলাভাবে

তির্য্যক্‌পাতন প্রক্রিয়া।
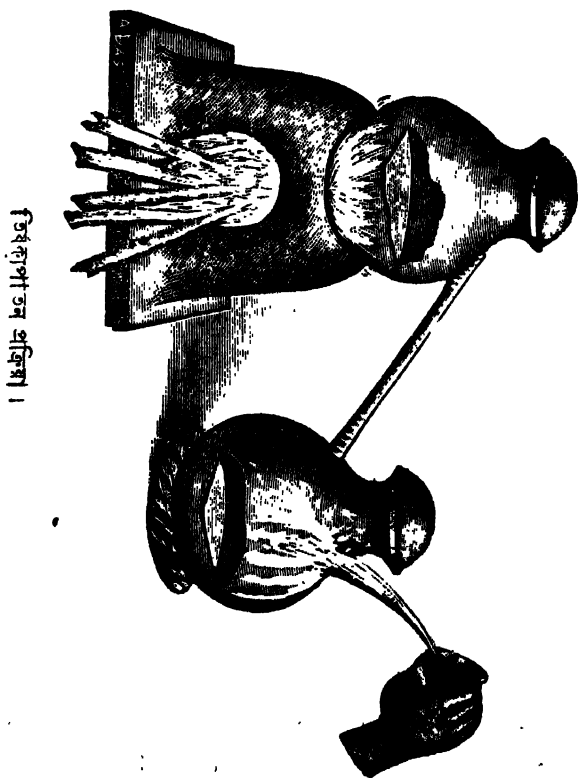
* রুষজাপান যুদ্ধের সময় ইহা লিখিত হয়।

মারা যাইবে ? না। সমুদ্র জল হইতে "মিষ্টি" জল প্রস্তুত করিবার সুন্দর প্রণালী আছে। এবার ছাকিয়া লইলে চলিবে না। এই প্রক্রিয়ার নাম "তির্য্যক পাতন," চলিত ভাষায় ইহাকে "চোলাই" করা কহে। অগ্নির উত্তাপে ময়লা জল প্রথমতঃ বাষ্পাকারে পরিণত হয়। পরে শীতল পাত্রের সংস্পর্শে ঐ জলীয় বাষ্প পুনর্ব্বার তরল হইয়া দ্বিতীয় পাত্রে জলরূপে সংগৃহীত হয় বা জমিতে থাকে। এই জল বিশুদ্ধ। প্রথম পাত্রস্থিত অপরিষ্কার জলে দ্রবীভূত লবণ ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ উক্ত পাত্রেই পড়িয়া থাকে।

প্রথম পাত্রে বা একটী কলসীতে ময়লা জল রাখিয়া উহার মুখে একখানি সরা ঢাকিয়া দেন। ঐ সরার মধ্যে একটী ছিদ্র করিয়া উহার সহিত একটী লম্বা বাঁশের বা রাংএর নল যোগ করিয়া দেন। কলসী ও সরার সন্ধি স্থলে ভালরূপ মাটীর প্রলেপ দেওয়া আবশ্যক। যেন জলীয় বাষ্প কোনরূপে সরার পাশ দিয়া বাহির হইতে না পারে। তার পর প্রথম কলসীর নীচে উত্তাপ দিলে ময়লা জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হইবে এবং নলের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইবে। নলের বাহিরের গাত্রে ভিজা নেকড়া দিয়া সর্ব্বদা শীতল রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ বাষ্প পুনরায় ঘনীভূত হইয়া বিশুদ্ধ জল উৎপন্ন হইবে। এবং দ্বিতীয় কলসীতে বা বোতলে ঐ বিশুদ্ধ জল জমিতে থাকিবে। ৩৬ পৃঃ প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য।

বিশুদ্ধকরণ সম্বন্ধে মোটামুটি দুই তিন প্রকার প্রণালী বা প্রক্রিয়া দেখান গেল কিন্তু গন্ধক কর্পূর প্রভৃতি পদার্থের সহিত ময়লা মাটী মিশ্রিত থাকিলে কি প্রকারে তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন ? এ সকল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হয় না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে না। একখানা সরার মধ্যে দ্রব্য স্থাপন করুন এবং

আর একখানি সরা দিয়া উহা ঢাকিয়া দেন। সরার সন্ধিস্থলে মাটী ও কাপড় দ্বারা প্রলেপ দিয়া যন্ত্রটী তপ্ত বালুকার উপর স্থাপন করুন এবং উর্দ্ধস্থিত সরার উপর ভিজা নেকড়া রাখিয়া দেন। নেকড়া শুষ্ক হইলে বিন্দু বিন্দু জল দিয়া পুনর্ব্বার সিক্ত করিতে হইবে। গন্ধক, কর্পূর প্রভৃতি পদার্থ উত্তাপ বশতঃ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উর্দ্ধগামী হইবে এবং পুনর্ব্বার উর্দ্ধস্থিত শীতল সরার নিম্নে জমিয়া সংলগ্ন হইয়া থাকিবে। মাটি, বালুকণা প্রভৃতি অধঃস্থিত সরার মধ্যে পড়িয়া থাকি-

উর্দ্ধপাতন দ্বারা পারদ বিশুদ্ধি
সরার পরিবর্ত্তে হাড়ি ব্যবহার হইয়াছে

বেক। এইপ্রক্রিয়ার নাম ঊর্দ্ধপাতন। ইহা দ্বারা গন্ধক, কর্পূর প্রভৃতি পদার্থ অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সচরাচর বাজারে যে পারা পাওয়া যায় তাহা রাঙ শিসা প্রভৃতি ধাতুর সহিত মিশ্রিত থাকে। পারার স্বধর্ম্ম এই যে ইহা লৌহ ভিন্ন অপরা-পর ধাতুর সংশ্রবে আসিলেই তাহাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঠিক পারার মত তরলাবস্থায় থাকে। এই পারদকে দোষনির্ম্মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ করিতে হইলে ঊর্দ্ধপাতিত করা আবশ্যক*।

ঊর্দ্ধপাতন দ্বারা রসসিন্দুর প্রস্তুতকরণ।

* মিশ্রিতো চেদ্রসে নাগবঙ্গৌ বিক্রয়হেতুনা
তাভ্যাং স্যাৎ কৃত্রিমদোষঃ তন্মুক্তি পাতনত্রয়াৎ। —রসেন্দ্রচিন্তামণি।

পাঠকগণ এমন মনে করিবেন না যে এতক্ষণ অনধিকার চর্চ্চা করা হইতেছে। কজ্জলী হইতে কি প্রকারে রসসিন্দুর প্রস্তুত হয় তাহা এখন সহজেই বোধগম্য হইবেক। এই প্রক্রিয়াও উর্দ্ধপাতন বই আর কিছুই নয়। রসেন্দ্রচিন্তামণিকার একটী বড় আবশ্যক বিষয় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রসেন্দ্রসারসংগ্রহে সে ত্রুটী লক্ষিত হয় না। ইহাতে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে—

"স্ফোটয়িত্বা তু মুক্তাভমূর্দ্ধলগ্নং বলিংত্যজেৎ
অধঃস্থং রসসিন্দুরং সর্ব্বেরোগেষু যোজয়েৎ"।

যাঁহারা স্বহস্তে রসসিন্দুর প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে রসসিন্দুর ও গন্ধক উভয়েই এই প্রক্রিয়া দ্বারা উর্দ্ধগ হয় ("উপে যায়") এই কারণে উর্দ্ধলগ্ন গন্ধক পরিত্যাগ করিয়া অধঃস্থ উজ্জ্বল দানাদার ও রক্তাভ রসসিন্দুর গ্রহণ করা হয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা যাক এই গন্ধক কোথা হইতে আসিল? "অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না"; গন্ধক নূতন সৃষ্ট হইল এমত হইতে পারে না। একটু সামান্য প্রণিধান করিলেই ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ২৫ পল পারদ ২ পল মাত্র গন্ধকের সহিত "রাসায়নিক রূপে" সংযুক্ত হইয়া ২৭ পল হিঙ্গুল বা রসসিন্দুর উৎপাদন করে। সুতরাং যদি তুল্য ভাগ অর্থাৎ ২৫ ভাগ পারদ ও ২৫ ভাগ গন্ধক মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করা যায় তবে ২৩ ভাগ গন্ধক অযুক্ত (uncombined) অবস্থায় থাকে। কজ্জলীর কৃষ্ণরেণুর সহিত হরিদ্রাভ গন্ধকরেণু হইতে পৃথক করা কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন কয়লা ও গন্ধক একত্র মাড়িলে কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়া হয়, অথচ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে কয়লার কাল কণিকাগুলি হরিদ্রাভ গন্ধকের কণিকার পাশাপাশি রহিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে কজ্জলীর অযুক্ত

গন্ধক, পরে প্রকৃত কজ্জলী ঊর্দ্ধগামী হয়। তবে প্রভেদ এই যে কৃষ্ণ-বর্ণ ধুলিবৎ কজ্জলী ঊর্দ্ধগামী হইলে রক্তাভ দানার আকারে পরিণত হয়। কিন্তু উভয়ের রাসায়নিক গঠন বা স্বরূপ একই প্রকার— তাহাতে কোন প্রভেদ নাই*।

এখন দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইবে। আমরা বুঝিতেছি পাঠকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন হিঙ্গুল, রসসিন্দূর চীনের সিন্দুর† ও মকরধ্বজে তবে প্রভেদ কি? মকরধ্বজ না স্বর্ণঘটিত? বাস্তবিক মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হইলে আমাদের কবিরাজ মহাশয়গণ রসেন্দ্রচিন্তামণি লিখিত প্রক্রিয়া অনু-যায়ী কজ্জলীর সহিত সূক্ষ্ম সোণার পাত "খাওয়াইয়া" থাকেন। আমরা রসেন্দ্রচিন্তামণিকারের মুখ দিয়াই এই প্রশ্নের উত্তর দিব। পারার সহিত রাং হউক আর সীসা হউক, বা সোনা রূপা প্রভৃতি যে কোন ধাতুই "খাওয়াও" না কেন, ঊর্দ্ধপাতন করিবার সময় এই সকল ধাতু নিম্নে পড়িয়া থাকে (৩৮—৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তবে যদি কেহ জিদ করেন যে যখন একবার সোণার সহিত "ছোয়ান" হই-য়াছে তখন "স্বর্ণঘটিত" বলিলে দোষ কি? রাসায়নিক এখন "নাচার।" যদি মকরধ্বজে সোণা না থাকিয়াও সোণার গুণ "অর্শে" এপ্রকার কাহারও বিশ্বাস হয়, হউক; তবে তাঁহাকে সপ্তম অধ্যায় অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

* পূর্ব্বোল্লিখিত "নির্দ্দিষ্টানুপাতিক নিয়ম" অপরিজ্ঞাত থাকায় এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল যে যতগন্ধক খাওয়ান যাইবে ততই পারদের গুণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে। নিত্যনাথ সিদ্ধকৃত রসরত্নাকরে দেখা যায়:—

জির্ণেগন্ধে পুনর্দেয়ং ষড়্ভিবারৈঃ সমংসমম্।
ষড়্গুণে গন্ধকং জীর্ণে মূর্চ্ছিতো রোগহাভবেৎ।

† রসসিন্দুর জলদিয়া যতই খলে মাড়া যায় ততই লাল হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে চীনদেশে এই প্রকারে সিঁদুর বানাইবার প্রথা চলিত আছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জোসেফ ব্লাক ও ক্ষার।

হিন্দু দার্শনিকগণের মতে যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ পঞ্চ ভূতাত্মক। দেহ নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। ইহা ভস্মীভূত হইলে যে অংশটুকু বায়ু (মরুৎ) হইতে উৎপন্ন তাহা বায়ুসাৎ হয় যাহা জল হইতে সম্ভূত তাহা জলে পুনরায় মিশিয়া যায়; যাহা মৃত্তিকা (ক্ষিতি) হইতে গঠিত তাহা মাটি হইয়া যায় ইত্যাদি। সাদৃশ্যমূলক অনুমান হইতে প্রাচীনেরা ভাবিতেন যে, যেমন দেহ ভস্ম হইয়া গেলে কেবল মৃত্তিকার ভাগ (অস্থিভস্ম) পড়িয়া থাকে, আর আর সমস্ত উপকরণ অন্যান্য ভূতের সহিত মিলিয়া যায়, তেমনি শুষ্ক কাষ্ঠ ভস্ম হইলে ঐ প্রকার হয়, অর্থাৎ কেবল ভস্ম বা ছাই অবশিষ্ট থাকে। গাছ পালা পোড়াইলে যে ছাই (বৃক্ষক্ষার) পড়িয়া থাকে তাহাও "মাটির" সামিল গণ্য হয়। অতি পুরাকাল হইতে গাছ পালার ছাই বা বৃক্ষ ক্ষার (বিশেষতঃ কলার 'বাসনার' ক্ষার) বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু আর এক প্রকার ক্ষার আমাদের দেশে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহাকে সাজিমাটি বলে। চরক ও সুশ্রুতেও এই দুই প্রকার ক্ষারের উল্লেখ আছে, যথা যবক্ষার—যবের শীর্ষ বা শীষ পোড়াইলে যে ভস্ম পাওয়া যায় তাহাই যবক্ষার নামে পরিচিত এবং সর্জ্জিকাক্ষার। সস্তা বিলাতী সাবানের উৎপাতে আর এখন কলার "বাসনার" ছাই বস্ত্রাদি

পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার হয় না। কিন্তু ৪০। ৫০ বৎসর বয়স্ক পল্লীগ্রামবাসী অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে দরিদ্র লোক পূর্ব্বে এইরূপ সাবানই ব্যবহার করিত এবং এই ক্ষারকে তীব্র করিবার জন্য ইহার জলের সহিত একটু চুণ মিশ্রিত করিয়া লইত। হিন্দু ঋষিগণ জানিতেন যে যবক্ষার ও সজ্জিকাক্ষার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকগণ এই দুই এর প্রভেদ বিশেষরূপে না বুঝিয়া গোলমাল করিয়া ফেলিতেন।

সুশ্রুত মতে পলাশ, আকন্দ, আপাং, কদলী প্রভৃতি গাছের ছাই জলে আলোড়িত করিয়া সেই জল একুশবার ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই জল কটাহে ভালরূপ হাতাদ্বারা নাড়িতে নাড়িতে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে ক্ষার জল স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল হইয়া আসিলে উহা পুনরায় পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। পরে কিট্ট ভাগ (গাদ) পৃথক করিয়া পুনর্ব্বার ঘন করিবে। ইহাই মৃদুক্ষার।

উক্ত ক্ষারজল আবার ঘুটিঙ পোড়ান চূণের সহিত মিশাইয়া জ্বাল দিবে, পরে ঘন হইয়া আসিলে ইহা লইয়া লৌহ পাত্রে রাখিবে। পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। এই উপায়ে মৃদুক্ষারকে তীক্ষ্ণ করা হয়।

প্রাচীন কাল হইতে জানা আছে যে ছাই, সাজিমাটী, ঘুটিঙ পাথর (অর্থাৎ যাহা পোড়াইলে চুণ হয়), শ্বেত পাথর (marble) প্রভৃতির উপর লেবুর রস, কাঁজি বা আঙ্গুর প্রভৃতির কোন অম্লরস প্রক্ষেপ করিলে ফেণার মত "গেঁজা" উঠিতে থাকে। Joseph Black পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে মৃদুক্ষারের এই গুণ আছে কিন্তু তীক্ষ্ণ ক্ষারের সে গুণ নাই। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন যে এই 'গেঁজান' বা ফেণার মত পদার্থ আর কিছুই নয়—অম্ল সংযোগে পূর্ব্বোল্লিখিত পদার্থ

সমূহ হইতে ধীরে ধীরে এক প্রকার 'বায়ু' নির্গত হইতে থাকে। ঝিনুক, শুক্তি, মুক্তা প্রভৃতি গুঁড়া করিয়া তাহার উপর লেবুর রস দিলেও এই প্রকার "গেঁজায়"। এই সকল কঠিন পদার্থে এই নবাবিষ্কৃত বায়ু "আবদ্ধ" থাকে এই জন্য ব্লাক ইহার নাম "আবদ্ধ বায়ু", রাখিলেন। ব্লাক স্পষ্টরূপে দেখিয়াছিলেন যে মৃদুক্ষার আর কিছুই নয়—এই আবদ্ধবায়ু সংযুক্ত তীক্ষ্ণক্ষার।

তীক্ষ্ণক্ষার + আবদ্ধ বায়ূ = মৃদুক্ষার।

যেমন মৃদুক্ষার হইতে (উত্তাপ বা প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা) "আবদ্ধ বায়ু" বাহির করিয়া লইলে উহা তীক্ষ্ণক্ষারে পরিণত হয় তেমন আবার তীক্ষ্ণক্ষারের সহিত "আবদ্ধ বায়ু" সংযুক্ত করিতে পারিলে উহা মৃদুক্ষারে পরিণত হয়। এখন দেখা যাক চূণ কি? সকলেই জানেন ঝিনুক ও ঘুঁটিঙ বা সাদা পাথর বিশেষ পোড়াইলে চূণ হয়। ইহার অর্থ আর কিছুই নয় কেবল পাথর প্রচণ্ডরূপে উত্তপ্ত হইলে উহা হইতে আবদ্ধ বায়ু বহির্গত হয়। অবশিষ্ট যে "চূণ" থাকে তাহা তীক্ষ্ণক্ষার মাত্র। ইহা এতই তীক্ষ্ণ যে পানের সঙ্গে একটু অধিক মাত্রায় চুণ সেবন করিলেই গাল "পুড়িয়া" যায়। এখন একটী সামান্য পরীক্ষা করা যাউক।

(১ম) বাজারের "সোডা" লইয়া তাহাতে একটু "এসিডের" গুঁড়া মিশ্রিত করুন। ইহাতে জল দিবা মাত্র "থক্-বক্" করিয়া যেন ফুটিতে থাকিবে—অর্থাৎ সোডা ও এসিডের সংযোগে আবদ্ধ বায়ু এত শীঘ্র ও জোরে নির্গত হয় যে বোধ হইবে যেন জল যথার্থই "ফুটিতেছে"।

(২য়) একটু পরিষ্কার চূণের জল কাচের গেলাসে লইয়া একটী নলে ফু দিয়া ঐ জলের মধ্যে ফুস্‌ফুসের বায়ু চালনা করুন। শীঘ্রই দেখিবেন যে চূণের জল দুধের মত সাদা হইতেছে। দুই চারি মিনিট এইরূপ করিয়া এই জল "থিতিতে" দিলে (অর্থাৎ স্থির ভাবে রাখিলে) কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে পাত্রের নীচে খড়ির গুঁড়ার মত সাদা সাদা কণিকা জমিয়াছে। ধীরে ধীরে উপরের পরিষ্কার জল অন্য পাত্রে ঢালিয়া পরে "চেকে" দেখিলে (আস্বাদন করিলে) স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে চূণের জলের তীক্ষ্ণক্ষার গুণ বা তীব্রতা চলিয়া গিয়াছে। এক টুকরা কাগজ হরিদ্রার রসে সিক্ত করিয়া তাহাতে ২।৪ ফোটা পরিষ্কার চূণের জল দিলে কাগজে লোহিতবর্ণ দাগ হয়। ক্ষার পদার্থ মাত্রেই এই ধর্ম্মাক্রান্ত। কিন্তু ক্ষারের তীক্ষ্ণতা বিনষ্ট হইলে হরিদ্রা রসের ঐরূপ বর্ণের পরিবর্ত্তন হয় না। শেষে উক্ত খড়ির মত সাদা কণিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর লেবুর রস বা কোন অম্ল দিলে আবার ফেণার মত "গেঁজাইতে" থাকিবেক।

(৩য়) একটী কাচের স্তম্ভাকৃতি পাত্রের ভিতর লৌহ তারে সংলগ্ন এক টুকরা জলন্ত কয়লা প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিবেন যে কয়লা ক্ষণকাল মাত্র জ্বলিয়া পরে নিবিয়া যাইবে। এই পাত্র পূর্ব্বে অম্লজান বায়ুতে পূর্ণ করিয়া যদি ঐরূপ পরীক্ষা করা যায় তবে তো কথাই নাই, কয়লা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিবে এবং ইহা হইতে চারি দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে। এই পাত্রে একটু সামান্য জল ঢালিয়া তাহা বিশেষ রূপে নাড়িলে দেখা যাইবে যে জল অম্লাক্ত হইয়াছে (হরিদ্রা কাগজ দিয়া পরীক্ষা করুন) অর্থাৎ কয়লা ও অম্লজানের সংযোগে ঐ জলের মধ্যে অম্লরসাত্মক বায়ু মিশ্রিত হইয়াছে। আস্বাদনেও ঐ জল সামান্য অম্লাক্ত বোধ হইবে। পরে এই পাত্রে পরিষ্ক র চূণের জল ঢালিয়া

একটু নাড়িলেই পূর্ব্ববৎ সাদা হইয়া যাইবে। এবং জল থিতিলে সাদা সাদা কণিকা পাত্রের নিম্নে পড়িয়া থাকিবে।

এই উভয় পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণ হইল যে ফুস্‌ফুস্‌ হইতে যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসের সহিত ত্যাগ করি—আর অঙ্গার দগ্ধ হইলে যে বায়ু উৎপন্ন হয়—ইহারা সমগুণ বিশিষ্ট। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "আবদ্ধ বায়ু" ও অঙ্গারকাম্ল বায়ু একই পদার্থ।

অম্ল ও ক্ষার এবং উহাদের গুণাপচয়।

অম্ল ও ক্ষার এক প্রকার সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ। প্রাচীন ঋষিরা এই অম্লাত্মক ও ক্ষারাত্মক পদার্থের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উভয়ের বৈষম্য বোধগম্য করাইবার জন্য মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শন মতে পৃথিবী ও অগ্নিগুণের আধিক্যে অম্লরস এবং কটু ও লবণ রসাধিক্যে ক্ষাররস উৎপন্ন হয়। ক্ষার ও অম্ল যে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অর্থাৎ ক্ষারের সহিত অম্ল মিশ্রিত করিলে ক্ষারের কটু তীক্ষ্ণতা ও অম্লের অম্লতা বিনষ্ট হয় তাহা সুশ্রুতেও আলোচিত হইয়াছে।*

এখন পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে যাঁহারা অম্ল রোগে

* রসেনাম্লেন তীক্ষ্ণেন বীর্য্যোষ্ণেন চ যোজিতঃ।
আগ্নেয়েনাগ্নিনা তুল্যঃ কথং ক্ষারঃ প্রশাম্যতি॥
এবং চেন্মন্যসে বৎস প্রোচ্যমানং নিবোধ মে।
অম্লবর্জ্জ্যান্ রসান্ ক্ষারে সর্ব্বানেব বিভাবয়েৎ॥
কটুকস্তত্র ভূয়িষ্ঠো লবণোঽনুরসস্তথা।
অম্লেন সহ সংযুক্তঃ স তীক্ষ্ণলবণো রসঃ॥
মাধুর্য্যং ভজতেঽত্যর্থং তীক্ষ্ণভাবং বিমুঞ্চতি।
মাধুর্য্যাচ্ছমমাপ্নোতি বহ্নিরদ্ভিরিবাপ্লুতঃ॥
—সুশ্রুত, ক্ষারপাকবিধি

ভুগিতেছেন এবং সর্ব্বদা অম্ল উদ্গার করিয়া থাকেন তাঁহারা একটু চূণের জল বা সোডা সেবন করিলেই সহজে উপশম পান—ইহার কারণ যে বিপরীত গুণ বিশিষ্ট অম্ল ও ক্ষার সংযোগে উভয়ের তীব্রগুণ নষ্ট হইয়া মাঝামাঝি একটী নূতন (neutral) পদার্থ উৎপন্ন হয় উহা অম্লও নয় ক্ষারও নয়।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে চূণের জল ক্ষারগুণবিশিষ্ট এবং আবদ্ধ বায়ু অম্লাত্মক এই উভয়ের মিশ্রণে যে খড়ি চূর্ণবৎ সাদা সাদা কণিকা উৎপন্ন হয় তাহাও নূতন পদার্থ এবং একেবারে ক্ষার ও অম্লগুণ বর্জ্জিত।

জোসেফ ব্লাকের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার আরও বিশে-ষত্ব এই যে তিনি সর্ব্বপ্রথমে পরিমাণাত্মক (quantitative) ভিত্তির উপর তাঁহার পরীক্ষা নিচয় সংস্থাপন করেন। এখন আমরা জানি যে ঝিনুক ও ঘুটিং পোড়াইলে যে চূণ হয় তাহা ওজনে পাতলা বা অনেক কম। ১০০ মণ ঘুটীও পোড়াইলে ঠিক ৫৬ মণ চূণ পাওয়া যায়। বাকী ৪৪ মণ অঙ্গারাম্ল বা "আবদ্ধবায়ুরূপে" চলিয়া যায়। সুত-রাং পরিমাণজ্ঞাপক রসায়নশাস্ত্রের ব্লাক যে পথপ্রদর্শক ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

পরিশ্রুত জল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে "পরিস্রুত জল" distilled water এর অর্থ বোধক বলিয়া উহার পরিবর্ত্তে অনেক সময় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে "পরিস্রুত" শব্দ এমত বিশদরূপে প্রয়োগ হইয়াছে যে

ভিন্নার্থ বোধক হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।* ক্ষার জলের সহিত আলোড়িত করিয়া বস্ত্রের দ্বারা ছাকিয়া লওয়াকেই "পরিস্রাব" কহে। ইংরাজী রাসায়নিক সাহিত্যে এই প্রক্রিয়াকে "Lixiviation of the ashes" বলে। চরক ও সুশ্রুতে distillation (চোলাই করা) প্রক্রিয়ার অনুরূপ কোন বিধি ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তদনুযায়ী কোন পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া বোধ হয় না। গোবিন্দ ভগবৎপাদ বিরচিত "রসহৃদয়" নামক প্রাচীন রসগ্রন্থে— "পাত্যপাতন যন্ত্রে" ও "তির্য্যকপাতন বিধাননিপাতিত সকল দোষ নির্ম্মুক্ত" ইত্যাকার প্রক্রিয়ার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। অতএব distillation ও distilled waterএর পরিবর্ত্তে 'পাতন' ও 'পাতিত বারি' এই দুই শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

* যথাঃ—সুশ্রুত—ক্ষারপাক বিধি, ১১ অধ্যায় সূত্র স্থান ; তক্ষেতর ক্ষার বদ্দগন্ধা পরিস্রাবয়েৎ"। "মহতি বস্ত্রে পরিস্রাব্যেত্তরং বিভজ্য চ।"

"পলাশভস্ম পরিস্রুতস্যোক্ষোদকস্য"

সুশ্রুত ১০ম অধ্যায়, চিকিৎসিত স্থান।

"ক্ষার প্রস্তুতকরণ"—চরক সংহিতা—২৬ অধ্যায়—"সূত্রস্থান দৃষ্টব্যঃ—ভস্মস্রাবাদি দ্বারা ক্ষার প্রস্তুত করা যায়।" বাঙ্গালা অনুবাদ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইউরোপে বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশন—ইহার উৎপত্তি ও কার্য্যকারিতা—নব্য রসায়নী বিদ্যার এক অধ্যায়।*

সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে (১৯০৪ খৃঃ) এখানে আসিয়া পৌঁছি। তখন এখানে গ্রীষ্মের ছুটী; বৈজ্ঞানিকগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কেহ সমুদ্রবক্ষে, কেহ বা আল্প পর্ব্বতোপরি, আবার কেহ বা আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতেছেন। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে কেমিকাল সোসাইটির (রাসায়নিক সভার) পুস্তকা-গার খোলা ছিল। এই স্থানে রসায়নশাস্ত্রবিষয়ক নানা ভাষায় লিখিত বহুমূল্য গ্রন্থনিচয় সংগৃহীত আছে; বিশেষতঃ এমন অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আছে, যাহা কলিকাতায় পাইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং চাতকের ন্যায় তৃষ্ণানিবারণ করিতে লাগিলাম; এবং হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক উপকরণ সংকলন করিতে সমর্থ হইলাম। এইপ্রকারে একমাস কাটিয়া গেল। কিন্তু আমি চঞ্চলচিত্ত হইয়া পড়িলাম। যাঁহারা সর্ব্বদা রাসায়নিক গবেষণা-গৃহে (laboratory) কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর;—বিশেষতঃ এই শীতপ্রধান দেশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক আমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

---

* "প্রবাসী" হইতে উদ্ধৃত।

লণ্ডনে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে ইহাঁর খোঁজ করি, কিন্তু তখন ইনি ফ্রান্সে ছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশন (The Royal Institution) দেখাইবার নিমিত্ত তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের পীঠস্থানগুলি দর্শন ও তত্রস্থ উপাসক ও পুরোহিত-দিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও চিন্তাবিনিময় করিবার জন্য আমি ইউরোপে আসিয়াছি। বলিতে কি, রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক দৃশ্য দেখিয়া প্রথমতঃ আমার মনে বড় একটা সম্ভ্রমের উদয় হইল না। আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজ ইহা অপেক্ষা বিশাল, এবং মনের মধ্যে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু শীঘ্রই মনের ভাব পরি-বর্ত্তিত হইয়া গেল। আমি তীর্থযাত্রী—যখন আমার পাণ্ডা অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া একে একে সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন, যখন প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "এই দেখুন কাচের আধারের (Glass case) মধ্যে যত্নে সংরক্ষিত যে সমস্ত যন্ত্র রহিয়াছে, তদ্দ্বারা ডেবী ও ফারাডে অনেক-গুলি যুগান্তরসংঘটনকারী আবিষ্ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন", ইত্যাদি —তখন আর ভক্ত প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না, ভাবে গদ্গদ হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক যখন তীর্থযাত্রী শ্রীক্ষেত্রে গিয়া জগন্নাথের দর্শন-লাভ করেন, তখন কি মূর্ত্তি কদাকার বলিয়া বিশ্বকর্ম্মার নিন্দা করিতে বসেন, না ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে থাকেন? বিখ্যাত রাসায়নিক ডাক্তার থর্প যথার্থই বলিয়াছেন:—

"রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনের রসায়নাগার চিরদিন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে পবিত্রভূমি বলিয়া গণিত হইবে। এখানেই ডেবী সেই সকল আবিষ্ক্রিয়া করেন, যদ্দ্বারা জড়বিজ্ঞানে যুগান্তর সংঘটিত হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের ভক্তেরা রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশন্ অপেক্ষা সুরম্য ও সুসজ্জিত বিজ্ঞানমন্দিরে আজ কাল নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু

মুসলমানের পক্ষে মক্কাধামে কাবা যেরূপ, রাসায়নিকের পক্ষে এই স্থানটী তদ্রূপ। ডেবী ও ফারাডের প্রতিভা ও কার্য্যপরম্পরা দ্বারা পবিত্রীকৃত এই গৃহে আসিয়া যে বিদ্যার্থীর উৎসাহ বাড়িবে না, বা অনুরাগ প্রগাঢ়তর হইবে না, তিনি কাহারও ঈর্ষার পাত্র হইতে পারেন না"।

আপনার পাঠকপাঠিকাবর্গের অবগতির জন্য এই রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনের উৎপত্তির বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। ইহা আদৌ গরিবলোকদের উপকারের জন্য স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কাউণ্ট রমফোর্ড ইহা স্থাপন করেন। তিনি ১৭৯৯ সালের প্রথমাংশে একটী পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহার নাম—"Proposals for forming by subscription in the metropolis of the British Empire a Public Institution for diffusing the knowledge and facilitating the general introduction of useful mechanical inventions and improvements, and for teaching, by courses of philosophical lectures and experiments, the application of science to the common purposes of life." ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অর্থকর শিল্প ও বিজ্ঞানের পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগসাধন, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদের সহযোগিতায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদির উন্নতিসাধন এবং জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধি রমফোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল। প্রস্তাবিকাতে সভার দুটী প্রধান উদ্দেশ্য এইরূপে বর্ণিত আছেঃ—"the speedy and general diffusion of the knowledge of all new and useful improvements, and teaching the application of scientific discoveries to the improvement of arts and manufactures in this country and to the increase of domestic comfort and convenience."

১৮০২ খৃষ্টাব্দে রমফোর্ডের সহিত এই সভার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তাহার পর হইতে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া সকল কিরূপে মনুষ্যের ধন-বৃদ্ধি, বা সুখবৃদ্ধির সহায় হইবে, মনুষ্যের কাজে লাগিবে, রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশন সে চিন্তা আর করেন না। এখন খাঁটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানবিস্তার ইহার কার্য্য। ডাক্তার গার্ণেট ইহার প্রথম অধ্যাপক বা আচার্য্য নিযুক্ত হন। তাহার পর ডেবী এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কোন দেশে বা যুগে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, তখন মঙ্গলময় বিধাতা যেন তাঁহার বিধান সংসিদ্ধ করিবার জন্য এক একজন মহাপুরুষ আনিয়া উপস্থিত করেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে ধর্ম্মজগতে, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক জগতে ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। গীতাকারোক্ত "সম্ভবামি যুগে যুগে" বচন সকল জাতির মধ্যে ও সকল দেশে প্রযোজ্য। অবশ্য কথাগুলি বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝিয়া লইতে হয়। নতুবা ধর্ম্মের, শিল্পের, সাহিত্যের, বিজ্ঞানের, নানাবিভাগে যুগপ্রবর্ত্তকগণের প্রত্যেককেই অবতার বলিতে হয়। তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যখন যেমন লোকের প্রয়োজন, সেইরূপ লোকের আবির্ভাব হয়। রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনও এইরূপে স্থাপিত হইল, ডাক্তার গার্ণেটের পর উপযুক্ত একজন রাসায়নিকের বিশেষ প্রয়োজন হইল; এমন সময় বিধাতা যেন ডেবীকে হাতে করিয়া আনিয়া বলিলেন, "এই লও"। বাস্তবিক যাহারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে চায়, ঈশ্বর তাহাদের সহায় হন। এখন ভারতে স্বর্গীয় তাতার প্রস্তাবিত

গবেষণা-মহাবিদ্যালয়ের মত একটি বিজ্ঞান-মন্দিরের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা স্থাপিত হইবার পর হয় ত কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, কাজ করিবার জন্য, ইহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে, কিন্তু যথা-কালে যে ইহার উপযুক্ত একজন লোকের আবির্ভাব হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে রম্‌ফোর্ডের ঐকান্তিক যত্নে এই পীঠস্থান স্থাপিত হয়, কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব ও প্রভার যশোভাগী ডেবী। তিনি দরিদ্রের সন্তান, বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধে পড়ে। এক ডাক্তারখানায় তিনি এপ্রেণ্টিস নিযুক্ত হন। কিন্তু সে সময়কার ডাক্তারখানা আর এখনকার ঔষধালয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ সময়ে তিনি একটিও রাসায়নিক পরীক্ষা (experiment) দেখেন নাই; এমন কি, রাসায়নিক যন্ত্র সকলের আকৃতি কিরূপ তাহাও জানিতেন না। তাঁহার যন্ত্রের মধ্যে ছিল, শিশি, মদের গেলাস, চায়ের পেয়ালা, তামাকের নল, এবং কখন কখন ধাতু গলাই-বার মাটির মূচী। আমাদের দেশের যুবকগণ অনেক সময় কেবল গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত হন, আর বলেন, রাসায়-নিক পরীক্ষা ও গবেষণা করিতে হইলে বড় বড় বিজ্ঞানাগার চাই—অজস্র টাকা চাই,—আমি ইহার উত্তরে ক্রমান্বয়ে ডেবী, ফারাডে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের চরিত্র বর্ণনা করিব। তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়—Where there is a will, there is a way.

যত কিছু বড় বড় আবিষ্কার, তাহা অনেক সময় "ক্ষেপা" বা "মাথাপাগলা" লোকের খেয়াল হইতে উদ্ভূত। যখন মহামতি প্রিষ্টলী, লাবোয়াসিয়ে প্রভৃতি দেখাইলেন যে সচরাচর যাহাকে দাহ (combus-

tion) ও শ্বাসগ্রহণ (respiration) বলে, তাহাতে বায়ুর উপকরণ অম্লজানেরই (oxygen) কাজ বেশী, এবং সেই সময়ে কাবেণ্ডিস প্রমাণ করিলেন যে, জল মৌলিক পদার্থ নয়—উদজান ও অম্লজান নামক দুই বিভিন্ন বায়ুর (gas বায়ু) রাসায়নিক সংযোগে এই যৌগিক (compound) পদার্থ উৎপন্ন, তখন এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই সময়কার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ও গ্রীক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূত সমবায়ে যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। হিন্দুগণ মৃত্যুকে যে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বলেন ইহার মূলে এই সিদ্ধান্ত রহিয়াছে ; অর্থাৎ মানুষ যখন মরে, তখন তাহার শরীরের উপাদানগুলি পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। কিন্তু যখন কাবেণ্ডিস দেখাইলেন যে "অপ্" (জল) একটা ভূত বটে কিন্তু মৌলিক পদার্থ নয়, তখন বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহা-হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। দিন দিন নূতন নূতন বায়ুর (gas) আবিষ্কার হইতে লাগিল—যথা যবক্ষারজান, ক্লোরিন ইত্যাদি। পূর্ব্বে "ক্ষেপালোকের" কথা বলিয়াছি। ডাক্তার বেডোজ (Beddoes) এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহার এক খেয়াল হইল—যেমন উদ্ভিজ্জ ও খনিজ নানাবিধ কঠিন ও তরল ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগের আরোগ্য হয়, তেমনি এই সকল নব-আবিষ্কৃত বায়ু সেবন করাইতে পারিলেও তদ্রূপ ফললাভ হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া (Pneumatic Institution) অর্থাৎ বায়বীয় হাঁসপাতাল স্থাপন করিলেন। অনেক রোগীও এই হুজুগে পড়িয়া এখানে উপস্থিত হইতে লাগিল। রাসায়নিক পরীক্ষাকার্য্যে দক্ষতার জন্য ডেবী ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেই এই হাঁসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে যবক্ষারজান (nitrogen) অম্লজান-সংযোগে প্রস্তুত (nitrous

oxide) এক বায়ু আবিষ্কৃত হয়। ডেবী পরীক্ষা করিয়া দেখাই-লেন যে, এই বায়ু সেবন করিলে যে, কেবল জীবনধারণ করা যায়, তাহা নয়, ইহাতে নাড়ী ক্রুততর হয়, মানুষকে ক্ষিপ্তের মত নাচায় এবং চিত্ত প্রফুল্ল রাখে। ইহার নাম সেই সময় হইতে হাসিবার (laughing), ঠিক বলিতে গেলে (laughter-causing gas) অর্থাৎ হাস্যোৎপাদক বায়ু হইল। চারিদিকে এক "হৈ চৈ" পড়িয়া গেল। মদিরা (a liquid), আফিং (a solid) সেবন করিলে মনে কত রকম ভাবের উদয় হয় ; দুঃখের বিষয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম। পাঠকগণ ডিকুইন্স বা কমলাকান্তের সাক্ষ্যগ্রহণ করুন। চিত্রকর গিল্‌রে কর্তৃক অঙ্কিত যে চিত্রের প্রতিলিপি আমরা দিলাম, তাহাতে দেখা যাইবে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনের কোষাধ্যক্ষ সার জন হিপ্‌সলী হাস্যোদ্দীপক বায়ু সেবন করিতেছেন এবং রমফোর্ড ও অনেক সৌখীন সাহেব ও মেম হা করিয়া দেখিতেছেন। ডাক্তার গার্ণেট বায়ুপ্রয়োগ করিতেছেন, ডেবী তাঁহার সহকারিতা করিতে-ছেন, রমফোর্ড দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন।

ডেবীর খ্যাতি তাঁহাকে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সংস্রবে আনয়ন করিল। সে সময় তিনি তরুণবয়স্ক যুবক মাত্র। তাঁহার বয়স তখন তেইশ পূর্ণ হয় নাই। রমফোর্ড প্রথমতঃ চেহারা দেখিয়া ভাবিলেন, এ ছেলে মানুষ আবার লেকচার দিবে কি ? এইজন্য রমফোর্ড প্রথমে এক ক্ষুদ্রগৃহে তাঁহার বক্তৃতা দেখিয়া তাঁহার ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হইয়া পরে তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে অনুমতি দেন।

কিছু দিনের মধ্যে ডেবী রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সর্ব্বেসর্ব্বা হই-লেন। এই সভা লণ্ডনের ধনী ও সৌখীন লোকদের চাঁদা দ্বারা

চলে। ডেবীর অপূর্ব্ব কবিত্ব ও বাগ্মিতায় ইহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল; এবং ইহার প্রতি লোকের অনুরাগ প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। ডেবী সর্ব্বত্র ধনী ও বিলাসীদের ভবনে নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন।

হাস্যোদ্দীপক বায়ুসেবন।
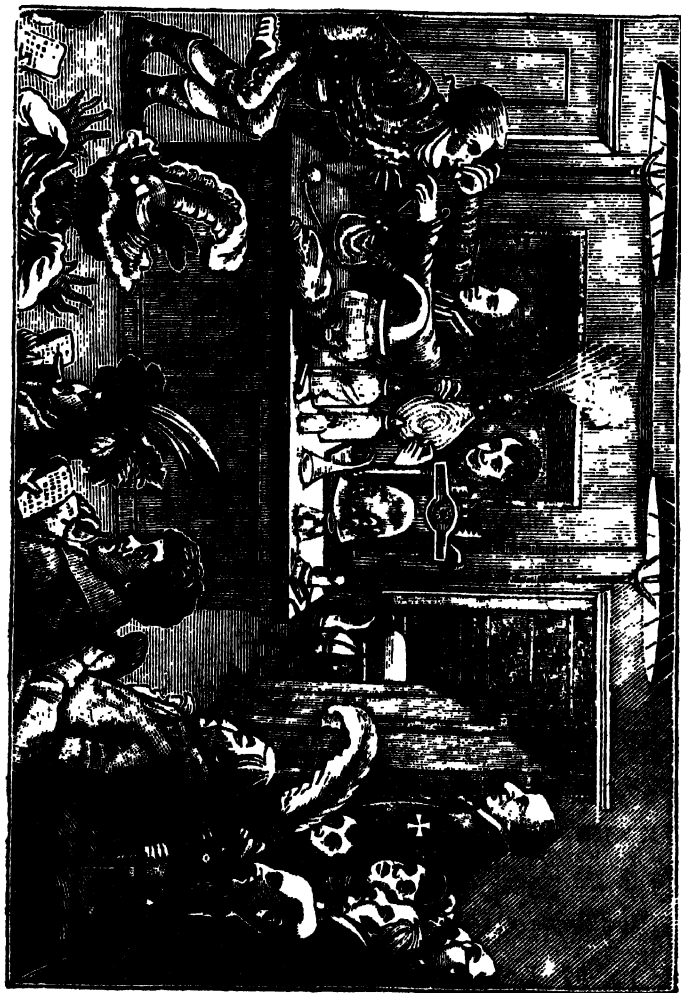
দিনে বিজ্ঞানানুশীলন ও রাত্রিতে সামাজিক আমোদ প্রমোদে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। সৌখীন লোকদের বাড়ীতে খাইতে যাইবার সময় তাড়াতাড়ি ময়লা কামিজ ও মোজা খুলিতে ভুলিয়া গিয়া তিনি তাহারই উপর আবার পরিষ্কার কামিজ ও মোজা পরিতেন। এইরূপে তিনি কখন কখন পাঁচটা কামিজ ও পাঁচজোড়া মোজা পরিয়া অজ্ঞাতসারে সং সাজিতেন। এই রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সহিত সংসৃষ্ট হইবার কিছু পরেই ডেভী কয়েকটী নূতন আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিক জগতে নবযুগের আবির্ভাব হইল এবং তাঁহার যশঃগৌরবও দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। এই বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে যে পঞ্চভূতাত্মক দেহ ও অন্যান্য পার্থিব পদার্থের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, ইহার মূলে বৈজ্ঞানিক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। হিন্দুরা বলেন এই নশ্বর দেহ ভস্ম হইয়া গেলে দেহের যে অংশটুকু বায়ু (মরুৎ) হইতে উৎপন্ন, তাহা বায়ুসাৎ হয়; যাহা জল হইতে উদ্ভূত, তাহা জলে পুনরায় মিশিয়া যায়; যাহা মৃত্তিকা (ক্ষিতি) হইতে গঠিত, তাহা মাটি হইয়া যায়: ইত্যাদি। কার্ব্বোগুস ও লাবোয়াসিয়ের সময় পর্য্যন্ত মোটামুটি বলিতে গেলে এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। সাদৃশ্যমূলক অনুমান হইতে প্রাচীনেরা ভাবিতেন যে, যেমন দেহ ভস্মীভূত হইলে কেবল মৃত্তিকার ভাগ (যথা অস্থি ভস্ম ইত্যাদি) পড়িয়া থাকে, আর সমস্ত উপকরণ অন্যান্য ভূতের সহিত মিশিয়া যায়, তেমনি শুষ্ককাষ্ঠ ভস্ম হইলেও ঐপ্রকার হয়। অর্থাৎ কেবল ভস্ম (ছাই) অবশিষ্ট থাকে। তেমনি প্রাচীন পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন, ধাতুও পঞ্চভূতাত্মক* সুতরাং লৌহ, তাম্র প্রভৃতি অগ্নিদগ্ধ

* যথা পারদ সম্বন্ধে রসার্ণব বলেন "পঞ্চভূতাত্মকঃ সূতঃ" XII. 50, Vide "Hindu chemistry" Sanskrit Text. q. 10.

করিলে অপরাপর উপাদান (বায়ু, জল ইত্যাদি) চলিয়া যায়, কেবল মৃত্তিকার অংশ পড়িয়া থাকে। আমাদের কবিরাজ মহাশয়েরা আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রোক্ত এই সমস্ত ধাতুভস্ম এখনও ঔষধার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাছ পালা পোড়াইলে যে ছাই পড়িয়া থাকে (বৃক্ষক্ষার), তাহাও "মাটির" সামিল গণ্য হয়। অতি পুরাকাল হইতেই এই গাছ পালার ছাই (বিশেষতঃ কলার "বাসনা") কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আর একপ্রকার ক্ষার আমাদের দেশে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা সাজিমাটি নামে পরিচিত। চরক ও সুশ্রুতেও এই দুই ক্ষারের উল্লেখ আছে—যথা বৃক্ষক্ষার, প্রধানতঃ যবক্ষার (৪র্থ অঃ ৪২—৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ও সর্জ্জিকাক্ষার। সস্তা বিলাতী সাবানের উৎপাতে আর কলার বাসনার ছাই এখন কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু যাঁহারা পাড়াগাঁয়ের লোক এবং ৪০।৫০ বৎসর বয়স্ক, তাঁহারা স্মরণ করিতে পারেন, দরিদ্র লোকে এই দেশী "সাবানই" ব্যবহার করিত এবং এই ক্ষারকে "তীব্র" করিবার জন্য ইহার সহিত একটু চূণ মিশাইত। প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ জানিতেন যে, যবক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষার বিভিন্ন। কিন্তু ইউরোপে গ্রীক দার্শনিকগণ এই দুয়ের প্রভেদ বড় একটা বুঝিতেন না; গোলমাল করিয়া ফেলিতেন। ডেবী স্বয়ং বলিতেছেন "The ancients do not seem to have distinguished between the two alkalies"। তাঁহার সময় অবধি ধারণা ছিল যে পূর্ব্বোক্ত এই দুই ক্ষারাত্মক মৃত্তিকা (alkaline earths) ভৌতিক বা মৌলিক পদার্থ মাত্র (elements)। কাবেণ্ডিস প্রথমতঃ দেখান যে অম্লজান ও উদজান মিশাইয়া তাহার মধ্যে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ চালাইবামাত্র ভয়ানক "আওয়াজ" হয়—যেন

তোপধ্বনি—আর এই দুই বায়ুর পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে জল প্রস্তুত হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, জল ভৌতিক হইলেও মৌলিক পদার্থ নহে। এই দুইপ্রকার বা ততোঽধিক মৌলিক পদার্থ সংযোগে যৌগিক (compound) পদার্থ প্রস্তুত-করণকে Synthesis (সংশ্লেষণ) কহে। কাবেণ্ডিসের পরীক্ষার প্রায় ১৫ বৎসর পরে (১৮০০ খৃঃ অঃ) কার্লাইল এবং নিকলসন্ নামক দুই বৈজ্ঞানিক জলের ভিতর তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়া জলকে অম্লজান ও উদজান নামক বায়ুতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ইহাকে বিশ্লেষণ (analysis) কহে। ১৮০৭ খৃঃ অঃ ডেবী এই প্রকারে "তীব্র" বা "তীক্ষ্ণ" যবক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষারের ভিতর এই তাড়িত-প্রবাহ চালাইয়া দেখাইলেন যে, ইহাদের প্রত্যেকে মৌলিক পদার্থ না হইয়া অম্লজান, উদজান ও দুই নবধাতুর সংযোগে গঠিত। এই দুই ধাতু রৌপ্যের ন্যায় সাদা ও চক্চকে—নাম পোটাসিয়ম্ ও সোডিয়ম্। ডেবী যখন প্রথমে এই দুই ধাতু পৃথক্ করিলেন, তখন তিনি এই অদ্ভুত আবিষ্কারে "মাতোয়ারা" হইয়া হর্ষে গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তবে আবার গবেষণাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রসায়নশাস্ত্রে নবযুগের আবির্ভাব হইল। ডেবী কর্ত্তৃক পোটাসিয়ম্ ও সোডিয়ম্ আবিষ্কারের পর আরও অনেক ভৌতিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। আজ কাল প্রায় (৭০) সত্তরটী ভৌতিক পদার্থ জানা গিয়াছে।

ডেবীর যশঃসৌরভ দিগ্দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। দরিদ্রসন্তান ডেবীর মাথা ঘুরিয়া গেল। ধনী ও বিলাসী সমাজে তাঁহার আদর আমন্ত্রণাদির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে আর্য্যঋষিগণের আদর্শই অনুকরণীয়। চালচলন সাদাসিদে, তপস্বীর মত হইবে, এবং মন উচ্চ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিবে, ইহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নব্যতর রসায়নী বিদ্যা।

এ পর্য্যন্ত যাহা নব্য রসায়নী বিদ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, বোধ হয়, পাঠককে পুনরায় বলিয়া দিতে হইবে না যে তাহা শতাধিক বৎসরের ও অধিক পুরাতন হইয়া গিয়াছে। এই একশত বৎসরের ভিতর পৃথিবীর নরনারী সকল কি না কাণ্ড দেখিয়াছে! ক্ষিপ্ত ফরাসি-জাতি কর্ত্তৃক দুষ্কৃতকারী রাজবংশের সেই অভূতপূর্ব্ব বিনাশ, তাহাদের চরম অভ্যুত্থান ও শোচনীয় পতন, প্রথম নেপোলিয়নের সেই তুবড়ি বাজির মত রাজত্ব ও দিগ্বিজয়,এসকল ঘটনা ত ঘটিয়াছে। আমেরিকায় শক্তিশালী যুক্তরাজ্যের অভ্যুদয়, নীতিজ্ঞ বিস্‌মার্ক কর্ত্তৃক জর্ম্মান জাতি সংগঠন, এবং উদীয়মান সূর্য্যের রাজ্যে অসীমপ্রভাবশালী পীত জাতির অভ্যুত্থান, এসকল একশত বৎসর পূর্ব্বে কি কেহ স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারিত? পৃথিবীর সকল বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল; দুর্ব্বল মানব দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ও ক্ষীণ চক্ষুঃ লইয়া যাহা অনুমান করিবে তাহা যে সকলই সত্য হইবে এরূপ ভরসা আমাদের নাই। ডাল্‌টন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরমাণুবাদ লোকসমাজে আবিষ্কার করেন। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা সবে দুই বৎসর মাত্র এ ঘটনার শতবার্ষিক উৎসব মাঞ্চেষ্টরে খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করাইলেন। কিন্তু ইহারই মধ্যে ডাল্‌টন্ যে পরমাণু লইয়া তাঁহার অনুমান স্থাপিত করেন, তাহাই লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। ডাল্‌টন গ্রীক দার্শনিকদিগের অনুকরণ করিয়া পরমাণুকে (atom—a-without and tome-division) অবিভাজ্য অণু নামে অভিহিত

করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ এখন যেরূপ প্রমাণ লইয়া উপস্থিত, তাহাতে পরমাণুকে আর অবিভাজ্য অণু বলা চলে না। প্রত্যেক পরমাণু কতকগুলি বৈদ্যুতিক অণুর (electron) সমষ্টি। এই সকল বৈদ্যুতিক অণু পরিমাণে উদজান বায়ুর পরমাণুর একের এক হাজার ভাগ মাত্র $\frac{১}{১০০০}$ এবং বিয়োগসংজ্ঞক (negative) বৈদ্যুতিক শক্তিপূর্ণ। পরমাণু কেহই কখন চর্ম্মচক্ষে বা যন্ত্রসাহায্যে দর্শন করিতে পারেন নাই, সুতরাং বৈদ্যুতিক অণু দর্শনের আশা সুদূরপরাহত বা একবারেই অসম্ভব। কিন্তু যে সব প্রমাণপরম্পরা দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ বৈদ্যুতিক অণুর সত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেগুলি ইউক্লিডপ্রণীত জ্যামিতির যুক্তির ন্যায় অখণ্ডনীয়।

যাঁহারা রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় দীক্ষিত নন, তাঁহারা হয় ত পূর্ব্বোক্ত কথা লইয়া উপহাস করিতে বসিবেন। তাঁহারা বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিবেন, "এই ত তোমাদের বিজ্ঞান? আজ যাহা ঠিক, কাল তাহা বেঠিক। ও সব লইয়া কেন মিছে বকাবকি কর?" পরমাণুবাদ কিয়দংশে ভ্রমাত্মক হইলেও, ইহা দ্বারা কোন উপকার হয় নাই বলা বাতুলতা মাত্র। সভ্য সমাজে আজ কাল শয়নে, অশনে, বসনে, রসায়নের সাহায্য ভিন্ন একদণ্ড চলে না। ডাল্‌টনের পরমাণুগুলি থাক বা নাই থাক, কুইনাইন্, কোকেন, ফেনাসেটিন্ প্রভৃতি মহামূল্য ঔষধগুলির রোগসংহারিক ধর্ম্ম লুপ্ত হইবে না; হরিৎ, কপিল, পীত, লোহিত প্রভৃতি বিচিত্র কৃত্রিমবর্ণগুলি কম জাজ্বল্যমান দেখাইবে না, শর্করার মিষ্টত্ব, লবণের লবণত্ব, লৌহের ভারসহত্ব, স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, মানবমানসক্ষেত্রে পরমাণুর অস্তিত্ব লোপের সহিত, অন্তর্হিত হইবে না। পরমাণুবাদ একশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত না হইলে, উনবিংশ শতাব্দীতে রসায়নের এতটা উন্নতি যে সম্ভবপর হইত

তাহা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিবে না। ভুল বা নির্ভুল হউক, একটা না একটা অনুমান অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহা না হইলে কোন বিজ্ঞানেরই কাজ চলে না। যেমন কোন নিম্নতর শাখা অবলম্বন করিয়া, উচ্চতর শাখাতে আরোহণ করিলে পর, নিম্নতর শাখাটী ভাঙ্গিলেও কোন ক্ষতি নাই, সেইরূপ কোন ভ্রমাত্মক অনুমান অবলম্বনপূর্ব্বক কতকগুলি নবাবিষ্কৃত পরীক্ষামূলক তথ্য দ্বারা স্থাপিত অপেক্ষাকৃত নির্ভুল অনুমানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করাতে কোন দোষ নাই। ফ্লজিষ্টনবাদেও ত ভুল ছিল, তাই বলিয়া কি ফ্লজিষ্টনবাদ রসায়নের প্রভূত উপকার সাধন করে নাই? পরমাণুবাদ কালে ফ্লজিষ্টনবাদকে আসনচ্যুত করিয়াছিল, এখন ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে নিজেই স্থানভ্রষ্ট। কিন্তু ডাল্টন্ যে নির্দ্দিষ্টানুপাতিক নিয়ম লোকসমাজে প্রচার করেন, তাহা প্রকৃত পরীক্ষামূলক তথ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, সুতরাং তাহার কোন নড়চড় সম্ভবপর নহে।

যাঁহারা এই সামান্য কথাটা বোঝেন না, তাঁহাদের বোধ হয়, গোড়ায় গলদ আছে। তাই এ বিষয় আর একটু বিশদভাবে বলা আবশ্যক। পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণমূলক তত্ত্বগুলি ও অনুমান লইয়া বিজ্ঞান গঠিত। অনুমান যদিও তত্ত্বগুলির ভিত্তি, কিন্তু ইহা স্থায়ী ভিত্তি নহে, নিত্যনৈমিত্তিক কাজ চালান গোছের (working hypothesis); আবশ্যক হইলে বদলান চলে। শুনিয়াছি বিশ্বকর্ম্মার বরপুত্র অদ্ভুতকর্ম্মা আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারেরা বিংশ-ত্রিংশতল অট্টালিকা অনায়াসে একস্থান হইতে স্থানান্তরে সমূলে লইয়া গিয়াছেন। ভিত্তিহীন হইয়াও বৃহৎ অট্টালিকার গাত্র হইতে চূণটিও পর্য্যন্ত খসে নাই। বৈজ্ঞানিক জগতে এক অনুমানের স্থানে অন্য অনুমানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা অনেকটা এইরূপ। শতাধিক বৎসর ধরিয়া

বৈজ্ঞানিক বংশপরম্পরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বস্বরূপ একখানি ইষ্টকের উপর যে আর একখানি ইষ্টক স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সমগ্রভাগ অটুট রহিয়াছে। পরীক্ষামূলক তত্ত্বগুলি ভগবদ্ধর্ম্মের ন্যায় বাস্তবিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুমানের পক্ষে অতটা বলা যায় না।

যে সকল তথ্যসমূহ দ্বারা ডাল্‌টনের পরমাণুবাদ ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাদের এখন সংক্ষেপে সময়ানুক্রমিক বিবরণ আবশ্যক। পনর কি কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আলোক ও বৈদ্যুতিক রশ্মি ভিন্ন যে অন্য কোনপ্রকার রশ্মি উৎপাদিত হইতে পারে তাহা বৈজ্ঞানিকেরা জানিতেন না। একটী আবদ্ধ কাচনলের (closed tube) দুইধারে ক্রমকর্ফ্কৃত যন্ত্র সংলগ্ন দুইটি তারের প্রান্ত সংলগ্ন করিয়া দিয়া যদি বৈদ্যুতিক শিখা (spark) পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে একটী উজ্জ্বল সরল বা বক্র রেখা দৃষ্ট হইবে। কিন্তু এই আবদ্ধকাচনল হইতে পারদচালিত বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা যদি প্রায় সমস্ত বায়ু অপসারিত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে শিখাটি সমগ্র নলমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে এবং বিবিধবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইবে। এই রশ্মিপুঞ্জ বিয়োগসংজ্ঞক প্রান্ত (electrode) হইতে আলোকরশ্মির মত বেগবান্ হইয়া সরলভাবে কাচপাত্রের গাত্রে পতিত হয়। কাচের যেখানটিতে পড়ে সেই স্থান উজ্জ্বল হরিৎবর্ণ ধারণ করে। প্রথমে সকলে মনে করিয়াছিলেন যে, এই রশ্মিগুলির কাচপাত্রের বাহিরে আসিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু ১৮৯৬ অব্দে রঞ্জেন নামক জর্ম্মানদেশীয় একজন পণ্ডিত দেখাইলেন যে, রশ্মিগুলি বাহিরে অদৃশ্যভাবে আসে এবং আসিয়া বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত হয়। এই রঞ্জেন-রশ্মিতে অন্ধকারে ফটো তোলা যায়, মানুষের শরীরের হাড় দেখা যায়, এবং কতকগুলি জিনিষ যেমন

সৌরকর-সংস্পর্শে আলোকবিভূষিত হয়, সেইরূপ অনেক বর্ণহীন বস্তুতেও এই অদ্ভুত রশ্মি বিচিত্রবর্ণ-আলোকতরঙ্গ উৎপাদিত করে। আলোকরশ্মির সহিত নূতন রশ্মির প্রধান প্রভেদ এই, যে, কোন স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিলেও ইহার কোন বিবর্ত্তন (refraction) ঘটে না।

রশ্মি সকল এইরূপ আশ্চর্য্যভাবাপন্ন দেখিয়া সকল বৈজ্ঞানিকই এই ব্যাপার লইয়া কিছু কিছু মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মুঁসো হেনরি বেকারেল মনে করিলেন যে, হয় ত কাচপাত্র হরিৎবর্ণে আলোকিত হইয়াছে বলিয়া এইরূপ ঘটিয়াছে। তিনি এই কারণে যে সব জিনিষ সূর্য্যরশ্মির সম্মুখে ধরিলে সবুজবর্ণ দেখায় সেইগুলি লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইউরানিয়মের অনেক যৌগিক পদার্থ এইরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট। ইউরানিয়ম ধাতু দুষ্প্রাপ্য পিচব্লেণ্ড-নামক কৃষ্ণবর্ণের একটী খনিজ পদার্থ হইতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সপ্তগ্রহ ছাড়া ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা আর দুইটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ইহাদের অন্ততরের নাম ইউরানস্। ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিৎ হার্সেল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ইউরানস্ গ্রহের নাম অনুকরণ করিয়া এই ধাতুর নামকরণ হইয়াছে। যদিও দুষ্প্রাপ্য, ইহার কতকগুলি যৌগিক পদার্থ শিল্প ও কলায় ব্যবহৃত হয়। পীতবর্ণ কাচ প্রস্তুত করিতে ইউরানিয়মের আবশ্যক হয়। ইউরানিয়ম ধাতুর যৌগিক পদার্থগুলি প্রতিফলিত (reflected) আলোকে পীতবর্ণ দেখায়। কিন্তু আলোক ও দ্রষ্টার মধ্যে ইহাদের জলীয় দ্রাবণ রাখিলে তাহা হরিৎ-বর্ণযুক্ত দেখায়। অধ্যাপক বেকারেল তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অনুমান সত্য কি না দেখিবার জন্য এই ইউরানিয়মের একটী যৌগিক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি

একখানি ফটোগ্রাফের কাচ কাল রঙ্গের কাগজে মুড়িয়া তাহার উপরে ইউরানিয়মযুক্ত যৌগিকপদার্থ স্থাপিত করিয়া একটী অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দেন। কিছু দিন পরে তিনি মোড়কটী খুলিয়া দেখেন যে কাচের উপরিস্থিত দানাগুলির ছবি কাচের উপর বেশ উঠিয়াছে।* এই সকল দেখিয়া বেকারেল তখন অনুমান করিয়াছিলেন যে ইউরানিয়ম হইতে নিষ্কাশিত রাশ্মগুলি রঞ্জেন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত রশ্মির সহিত অভিন্ন। এই অনুমান এখন ভ্রমমূলক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। সেই প্রমাণগুলির কথা ক্রমশঃ বলিতেছি। প্রমাণ যাহারা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রথমে দুই এক কথা বলা আবশ্যক।

মাদাম কুরী (কুমারী নাম মেরিস্ক্লাদোবোস্কি) ১৮৬৭ অব্দে পোলাণ্ড দেশে ওয়ারস্ব নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পারিসের উপকণ্ঠস্থ বার্সেলিস নগরের একটী মহিলা বিদ্যালয়ের ইনি এখন শিক্ষয়িত্রী। জন্মস্থান ওয়ারস্বনগরের এবং পারিসে শিক্ষাসমাপন করিয়া ইনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন। সম্প্রতি যে অধ্যাপক কুরীর শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ রয়টার আমাদিগকে তারযোগে জানাইয়াছেন, ইনি আট দশ বৎসর হইল তাঁহাকে বিবাহ করেন। মাদাম কুরী এবং তাঁহার স্বামী ১৮৯৮ অব্দে পিচব্লেণ্ড হইতে রাডিয়ম নামক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাদাম কুরীই প্রথমে এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের সূচনা করেন।

---

*কলিকাতার গ্যাসের আলোর উপর আজ কাল যে তারের আবরণ দেখা যায়, তাহাতে থোরিয়ম নামে একটী radioactive বা "সক্রিয়" পদার্থ আছে। যদি অন্ধকার ঘরে কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফিক কাচের উপর এই তারের আবরণ রাখাযায় তাহা হইলে দুই তিন দিনের ভিতর বেশ ছবি উঠে।

বেকারেল ইউরানিয়ম হইতে উৎপন্ন যে সকল রশ্মি আবিষ্কার করেন, তাহা তাঁহার সম্মানার্থ "বেকারেল রশ্মি" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সকল বেকারেল র‍শ্মি ফটো তোলা ছাড়া অন্য অনেক আশ্চর্য্যগুণবিশিষ্ট। জলীয় বাষ্পকণাবিহীন বায়ু তড়িতের গতির প্রতিরোধ করে, ইহা তড়িৎপরিচালক নয়। বেকারেল রশ্মি এইরূপ বায়ুর ভিতর দিয়া গমন করিলে, অপরিচালক বায়ুকে পরিচালক করিয়া তোলে। এই গুণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য স্বর্ণপত্রদ্বয়বিশিষ্ট একটি তড়িৎপরিমাপক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র অতি সরল। শুধু একটি কাচের আবরণের ভিতর দুইটি স্বর্ণপত্র ঝোলান আছে। বৈদ্যুতিক শক্তি নিকটে আসিলে সমভাবসম্পন্ন একই তড়িতের বিকর্ষণশক্তিপ্রভাবে পত্র দুইটী বিস্ফারিত হয়। পত্র হইতে তড়িৎ অপসারিত হইলে, আবার পত্র দুইটী একত্রিত হয়। ইউরানিয়মযুক্ত পদার্থ নিকটে আসিলে বিস্ফারিত পত্র দুইটী তৎক্ষণাৎ একত্রিত হয়, কেননা বেকারেল রশ্মি প্রভাবে কাচ আবরণের মধ্যস্থ বায়ু পরিচালনগুণশালী হইয়া তড়িৎ অপহরণ করে। যে সকল পদার্থ এইরূপ অন্ধকারে ফটো তুলিতে এবং অপরিচালক বায়ুকে পরিচালক করিতে পারে তাহাদিগকে radioactive বা সক্রিয় বলা যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ ক্ষমতাবিহীন পদার্থের নাম নিষ্ক্রিয় হইবে।

মাদাম কুরী এইরূপে ইউরানিয়মের কতিপয় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের বিকিরণ শক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেখিলেন যে তাহারা প্রায় সমানশক্তিশালী। একখণ্ড ইউরানিয়ম ধাতু লইয়া দেখা গেল যে তাহারও বিকিরণ শক্তিপরিমাণে বিশেষ বিভিন্ন নয়। কিন্তু ইউরানিয়ম ধাতু যে প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয় সেই পিচব্লেণ্ড, ইউরানিয়ম অপেক্ষা বহুগুণশক্তিশালী বলিয়া পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইল।

ইহা হইতে এই অনুমান স্বতঃসিদ্ধ যে, পিচব্লেণ্ডে প্রস্তরে ইউরানিয়ম অপেক্ষা বহুগুণশালী একটি সক্রিয় পদার্থ আছে। এই সক্রিয় পদার্থটী মুসো এবং মাদাম কুরী ইউরানিয়ম প্রস্তর হইতে বিভিন্ন করেন। অবিরত তাপরশ্মি ও বৈদ্যুতিক কণা বিকিরণ করে বলিয়া কুরীদম্পতী ইহার নাম র্যাডিয়ম রাখিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বুন্‌সেন্‌ এবং কার্কফ অভিনব উপায়ে দুইটী ধাতু আবিষ্কার করেন। অনেক ধাতুর উত্তপ্ত বাষ্প ত্রিশির কাচে (prism) বিশ্লিষ্ট হইলে পর যন্ত্রসাহায্যে উজ্জ্বল স্পষ্ট রেখা-বিশিষ্ট দেখা যায়। প্রত্যেক বিভিন্ন ধাতুর রেখা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বুন্‌সেন্‌ ও কার্কফ ডুর্ক্‌হাইমস্থিত প্রস্রবণের জলে কতিপয় নূতন রেখা দেখিতে পান এবং এক হাজার মণ জল উত্তাপ দ্বারা বিশোষিত করিয়া উল্লিখিত দুইটী ধাতুর আবিষ্কার করেন। কুরীদম্পতী ইহা অপেক্ষা কঠিন কার্য্য সংসাধিত করিয়াছেন। পিচব্লেণ্ডের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য প্রস্তরের প্রায় ত্রিশ মণ বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা নূতন ধাতুর একটী যৌগিক পদার্থের মোটে বিশ পনর রতি বিশুদ্ধভাবে পাইয়াছিলেন। শুধু রাসায়নিক বিশ্লেষণে এ কার্য্য শিবের অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁরা ইহাঁদের তড়িৎপরিমাপক যন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক বিশ্লিষ্ট ভাগ সক্রিয় কিনা এবং কত পরিমাণে সক্রিয়, ইহা পদে পদে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। র্যাডিয়ম ছাড়া পিচব্লেণ্ড হইতে পলোনিয়ম এবং এক্টিনিয়ম (বা জ্যোতিঃশালী) নামে দুইটী বিশেষভাবে সক্রিয় পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রথমোক্তটির নাম মাদাম কুরী তাঁহার অভাগিনী জন্মভূমির নাম অনুসারেই দিয়াছেন। এই দুইটী পদার্থ র্যাডিয়ম অপেক্ষাও অত্যল্প পরিমাণে পিচব্লেণ্ডেতে পাওয়া যায়।

র‍্যাডিয়ম যে তাপরশ্মি ও বৈদ্যুতিক কণা বিকিরণ করে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ র‍্যাডিয়ম মনুষ্য-চর্ম্মের নিকট রাখিলে সেই খানে ক্ষত হয়। শুনা যাইতেছে দুঃসাধ্য ক্যান্সার রোগ নাকি র‍্যাডিয়ম রশ্মিদ্বারা আরাম হইতে পারে। র‍্যাডিয়ম তিন-প্রকার রশ্মি বিকিরণ করে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা গ্রীক বর্ণমালা-নুসারে ইহাদের নাম আলফা, বিটা ও গামা রাখিয়াছেন। ইহা-দের মধ্যে আলফা রশ্মির অণুসকল যোগসংজ্ঞক-তড়িৎশালী এবং পরিমাণে প্রায় উদজান বাষ্পের পরমাণুর সমান। বিটা রশ্মি ৬১ পৃষ্ঠে উক্ত বৈদ্যুতিক অণু হইতে অভিন্ন। এবং গামা রশ্মি রঞ্জেন-কিরণ-সদৃশ। প্রথমোক্ত দুইটী রশ্মি থাকার দরুণ অনেক পদার্থ র‍্যাডিয়মের নিকট রাখিলে বিভিন্ন প্রকার বর্ণে রঞ্জিত হয়, প্রকৃত হীরক র‍্যাডিয়মের নিকট স্থাপন করিলে সবুজ বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু কৃত্রিম হীরকের এপ্রকার শক্তি নাই। কৃত্রিম হীরক চিনিবার ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। গন্ধকের সহিত যশদের (zinc) একটী যৌগিক পদার্থ আছে। এই পদার্থটি একটী কাগজে লাগা-ইয়া র‍্যাড়িয়মের নিকট ধরিলে অসংখ্য জোনাকি বসানর মতন (scintillatious) দেখায়।

এই অদ্ভুত পদার্থের অভিনবত্ব দুই এক কথায় সাঙ্গ করা যায় না। আত্মারাম সরকারের হাড়ের মত ইহা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। র‍্যাড়িয়মের কোন যৌগিক পদার্থ জলে দ্রব করিলে যে বায়ু নিষ্কাশিত হয়, অধ্যাপক রামসে দেখাইয়াছেন যে তাহার মধ্যে তাঁহার নব আবিষ্কৃত হিলিয়ম বায়ু বিদ্যমান আছে। হিলিয়ম বায়ু একটি মৌলিক পদার্থ, আমাদের বায়ুমণ্ডলের দশ লক্ষ ভাগে এক কি দুই ভাগ এইরূপ অনুপাতে বর্ত্তমান। সূর্য্যের রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া

জ্যোতির্ব্বিৎ লক্‌ইয়ার সাহেব ইহার সূর্য্যে স্থিতি প্রথমে প্রমাণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হিলিয়ম। হিলিয়ম যে একটি মৌলিক পদার্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একটী মৌলিক পদার্থ যে আর একটী মৌলিক পদার্থে পরিণত হইতে পারে ইহাই তাহার প্রথম উদাহরণ। চাই কি, কিছুকাল পরে মধ্যযুগের রাসায়নিকদিগের স্বপ্ন সফল হইতে পারে; তাহা হইলে হীনধাতুদিগকে স্বর্ণে ও রৌপ্যে পরিণত করা অসম্ভব হইবে না।

এখন কথা হইতেছে যে, কোথা হইতে র‍্যাডিয়ম এইরূপ অদ্ভুতশক্তি সকল বিকিরণ করিতেছে? বৈজ্ঞানিকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, র‍্যাডিয়ম স্বীয় পরমাণুস্থ আবদ্ধ শক্তি এইরূপে বিকিরণ করিতেছে। এইরূপ বিকিরণশক্তি থোরিয়ম ও ইউরানিয়ম নামক গুরুভার পরমাণুবিশিষ্ট পদার্থদ্বয়ে বিদ্যমান আছে। পরমাণু সকল যে আরও ক্ষুদ্রতর বৈদ্যুতিক অণুবিশিষ্ট তাহা প্রায় সর্ব্বসাধারণে আজ কাল স্বীকার করেন। র‍্যাডিয়মের পরমাণু পরিমাণে উদজানের পরমাণু অপেক্ষা ২২৫ গুণ এবং উদজানের পরমাণু প্রায় এক হাজার বৈদ্যুতিক অণুর সমষ্টি। গুণ করিলে দেখা যায় যে র‍্যাডিয়ম পরমাণুতে প্রায় দুই লক্ষ বৈদ্যুতিক অণু বিদ্যমান। অল্প স্থানের ভিতর এতগুলি কণা থাকিতে না পারিয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি এইরূপ বৈদ্যুতিক অণু দ্বারা গঠিত। কিন্তু তাহারা কেন সক্রিয় হয় না তাহা আজও পর্য্যন্ত কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই।

বৈজ্ঞানিকেরা জলে, স্থলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, বায়ুমণ্ডলে ও বায়ু

মণ্ডল হইতে পতিত উল্কাতে সকল স্থানেই অত্যল্প পরিমাণে সক্রিয় পদার্থের আভাস পান। কিন্তু কোথাও বেশী পরিমাণে পান নাই। বেশী পরিমাণেও থাকিতে পারে না, কেননা র‍্যাডিয়মের ন্যায় সকল সক্রিয় পদার্থই বিনাশশীল। বৈজ্ঞানিকগণ অঙ্ক কসিয়া দেখাইয়াছেন যে র‍্যাডিয়মের আয়ু এক হাজার বৎসর। পৃথিবীর বয়স অনেক হাজার বৎসর হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে এখন কথা উঠিতে পারে যে এখনও কেন র‍্যাডিয়ম পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। ইহার এক মাত্র উত্তর এই যে, যেমন র‍্যাডিয়ম হইতে হিলিয়ম উৎপন্ন হইতেছে, সেইরূপ অন্য কোন মৌলিক ধাতু হইতে র‍্যাডিয়ম অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে এবং উৎপন্ন হইয়াই ক্রমশঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইয়াছেন যে, যে স্থানে র‍্যাডিয়ম পাওয়া গিয়াছে, সেই খানে ইউরানিয়মও বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন-প্রকার ইউরানিয়মের খনিজ পদার্থেও র‍্যাডিয়ম ও ইউরানিয়মের অনুপাত প্রায় এক রকম। এই সব দেখিয়া শুনিয়া, ইউরানিয়ম হইতে যে র‍্যাডিয়ম উৎপন্ন হইয়াছে তাহা খুব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

একজন খ্যাতনামা ফরাসী বৈজ্ঞানিক তাঁহার প্রণীত রাসায়নিক গ্রন্থের ভূমিকায় নিম্নোক্ত ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন:—"রসায়ন-শাস্ত্র ফরাসি-দেশীয় বিজ্ঞান এবং অমরকীর্ত্তিশালী ফরাসি-দেশীয় বৈজ্ঞানিক লাবোয়াসিয়ে ইহার স্থাপয়িতা।" স্বদেশ-ভক্ত লোকের নিজের দেশের প্রশংসা হইতে অবশ্য কিছু বাদসাদ দিয়া লইতে হয়। নব্য রসায়নী বিদ্যা লাবোয়াসিয়ের নিকট কতদূর ঋণী তাহা পুস্তকের প্রারম্ভেই উল্লিখিত আছে। নব্যতর রসায়নী বিদ্যার উৎপত্তিও ফরাসী দেশ হইতে। অধ্যাপক

বেকারেল, পণ্ডিতবর কুরী এবং তাঁহার সুযোগ্যা ও বিদুষী সহধর্ম্মিণী এই নূতন বিজ্ঞানের জনয়িতা তাহা ফরাসি জাতি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়।

জ্ঞানোন্নতি ও ভারতের অধঃপতন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে চিরপ্রচলিত সংস্কার মানব-হৃদয়ে এরূপ প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে যে কোনরূপ নূতন স্বাধীন চিন্তা সহজে উহার মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায় না। বংশপরম্পরাগত সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া মানবাত্মা একরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে। পুরাকালের খ্যাতনামা মনস্বিগণের বাক্যের উপর সাধারণ লোকের ভক্তি ও বিশ্বাস এমন বদ্ধমূল যে, সহজে কেহ তাহার প্রতিকূলে কার্য্য করিতে সাহসী হয় না। শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সব ব্যবস্থা ও মত প্রচারিত হইয়াছিল, অদ্যাপি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকলে তাহার অনুসরণ করিতেছে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্বাধীনচেতা মহাত্মা ঐ সকল আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিলেও পুরাতন মতের প্রতিপোষক (গোঁড়া) দিগের ভীষণ আন্দোলনে তাঁহাদের সেই ক্ষীণ প্রতিবাদ সমাজে প্রচারিত হইতে পায় নাই।

সময়ে সময়ে জগতে এক এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা অজ্ঞান-তিমিরে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় অলোকসামান্য প্রতিভাবলে প্রকৃষ্ট পথ দেখিতে পান। পৃথিবী সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল, আর চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহমণ্ডলী নিত্য ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে ইত্যাদি মত টলেমি ও পিথাগোরসের সময় হইতে ইউরোপে প্রচলিত ও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। কোপারনিকাস এই মতের প্রতিবাদ

করিয়া এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু ছত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তাহা জনসমাজে প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। ইহার কারণ তখন খৃষ্টজগতে বাইবেল অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত ছিল। কোপারনিকাসের মত বাইবেল-বিরুদ্ধ; এবং যাঁহারা কোন নূতন মত প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন তাঁহাদের জীবন অনেক সময় বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিত। সে সময়ে Court of inquisition নামক ধর্ম্ম-আদালতের সম্মুখে নব মতের প্রচারকগণকে নানারূপ প্রশ্ন করা হইত। তথায় তাঁহারা স্বকীয় নূতন মত প্রত্যাহার করিতে অস্বীকার করিলে তাঁহাদিগকে অমানুষিক ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। এই সকল কারণে কোপারনিকাস সভয়ে লিখিয়াছিলেন যে আমি এমন কথা বলিতেছি না যে আমার মত যথার্থ; তবে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ইত্যাদি আলোচনা করিয়া বোধ হয় সৌরজগতের গতিবিধি সম্বন্ধে প্রাচীন মত অপেক্ষা আরও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। ইহার পরিণাম তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছিল; অর্থাৎ আদালতের বিচারে তাঁহার মত সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিগর্হিত ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছিল। যাহা হউক, কোপার্নিকাস প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। ইহার ৯০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৩২ খৃঃ অব্দে গালিলেও কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করিয়া আর একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তাঁহার শোচনীয় পরিণাম সর্ব্বজন-বিদিত।

মহানুভাব রজার বেকন (খৃঃ ১২১৪—১২৮৪) নানা-প্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময়ের তুলনায় তাঁহাকে অসামান্য লোক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সাধারণতঃ তিনি wizard বা ঐন্দ্রজালিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ তখন

যাঁহারা এই বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন লোকে তাঁহাদিগকে "যাদুকর" বলিত। এই ঐন্দ্রজালিক বা পৈশাচিক বিদ্যা আলোচনা করার জন্য তখন বেকনকে অক্সফোর্ডের একটী নিভৃত কক্ষে চতুর্দ্দশ বৎসর কারারুদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। যাঁহারা তখন প্রাকৃততত্ত্ব বা পদার্থবিদ্যা আলোচনা করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে এই প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জল অতি পুরাকাল হইতে মৌলিক পদার্থ এবং পঞ্চভূতের মধ্যে অন্যতম বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল। পরে কাবেণ্ডিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক পণ্ডিতগণের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, জল মৌলিক পদার্থ নয়, সম্পূর্ণ যৌগিক পদার্থ এবং দুইটী অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন। আধুনিক সমুদয় মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধেও সকলের এইরূপ ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা যে সকল পদার্থকে এখন মৌলিক পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতেছি, তাহাদের মৌলিকত্ব সম্বন্ধেও এইরূপ সংশয় সহজেই আসিয়া থাকে। অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থ হইতে যদি কোনরূপ অভিনব প্রক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যতে আরও নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হয়, তখন তাহার মৌলিকত্ব লুপ্ত হইয়া তাহাকে যৌগিক পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। রবার্ট বয়েল তাঁহার "সংশয়বাদী রাসায়নিক" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে সমস্ত মৌলিক পদার্থের পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব, অর্থাৎ যে, সকল পদার্থকে অদ্যাপি কোনরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় নাই, তাহাদিগকে আপাততঃ মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি কোনও শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া মানেন নাই এবং চিরপ্রচলিত

অনেক মতের বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করিয়া ভাবি জ্ঞানোন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

আমাদের ভারতবর্ষ যে ব্রাহ্মণশাসিত এবং জাতিভেদ ও শাস্ত্রবাদ-গ্রস্ত হইয়া চিরকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, এমন নহে। প্রাচীন ভারতেও অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি যথেষ্ট বলবতী ছিল এবং স্বাধীন চিন্তা-স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। এমন কি, মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। কেননা ইহা সহজে সপ্রমাণ হয় না। কপিল তথাপি বেদের দোহাই দিয়াছেন। যাহা হউক ষড়্‌দর্শন ও উপনিষদে বেদ অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং সমগ্র হিন্দুজাতির মুখ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু চার্ব্বাক মুনি শ্রুতিও অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন :—

"কতিপয় প্রতারক ধূর্ত্তেরা বেদ সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে স্বর্গ নরকাদি নানাপ্রকার অলৌকিক পদার্থ প্রদর্শন করত, সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহারা স্বয়ং ঐ সকল বেদবিধির অনুষ্ঠান করত জন-সমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে এবং রাজাদিগকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিপুল অর্থলাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় পরিজন প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, উত্তরকালীন লোক সকল ঐ সমস্ত বেদোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে, বহু কাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দণ্ডধারণ, ভস্মগুণ্ঠন এই সমস্ত বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরীযাগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেনযাগ করিলে শত্রুনাশ হয়। তদনুসারে অনেকেই ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কোন ফলই দৃষ্ট হইতেছে না।"

এক স্থানে বিধি আছে সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, অন্য স্থানে কহিতেছে, সূর্য্যোদয়ে হোম করিবেক না, যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ে হোম করে, তাহার প্রদত্ত আহুতি রাক্ষসের ভোগ্য হয়। এইরূপে বেদে অনেক বাক্যের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায় এক কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে, তখন কি প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? অতএব, স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা সমস্তই মিথ্যা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলও নিষ্ফল। ফলতঃ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম সকল অবোধ ও অক্ষম ব্যক্তিদিগের জীবনোপায় মাত্র।

ধূর্ত্তেরা ইহাও কহিয়া থাকে যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে জীবের ছেদন হইয়া থাকে সে স্বর্গলোকে গমন করে। যদি ঐ ধূর্ত্তদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞেতে আপন আপন পিতা মাতা প্রভৃতির মস্তকচ্ছেদন না করে কেন? তাহা হইলে অনায়াসে পিতা মাতা প্রভৃতির স্বর্গলাভ হইতে পারে, এবং তাহাদিগকে আর পিতা মাতার স্বর্গের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। আর শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাটীতে তাহার উদ্দেশে কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে। অপিচ, এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে যদি স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি না হয় কেন? যাহাতে কিঞ্চিদুচ্চস্থিতের তৃপ্তি না হয় তবে তদ্দ্বারা অত্যুচ্চ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অত-

এর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র, বস্তুতঃ কোন ফলোপধায়ক নহে।" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ--জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকৃত অনুবাদ)।

সেই সময়ে স্বাধীন চিন্তা কতদূর উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল তাহা চার্ব্বাক দর্শন আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। তাহার পর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভারতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। তাহার ফলে জ্ঞানোন্নতির পথ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত হওয়ায় সর্ব্ব শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধগণ রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। একা নাগার্জ্জুনের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইনি সুশ্রুত তন্ত্র পরিবর্দ্ধিত ও নূতন আকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। বাস্তবিক সুশ্রুতে বৌদ্ধ মতের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে শব-ব্যবচ্ছেদের সুন্দর নিয়মাবলী এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করিবে না এমন উপদেশ দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গহৃদয়-প্রণেতা বাগ্‌ভটও বৌদ্ধ ছিলেন; পাছে হিন্দুরা তাঁহার মত অগ্রাহ্য করেন এই বুঝিয়া স্থানে স্থানে শ্লেষ বা ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"যদি ঋষিপ্রণীত বলিয়াই গ্রন্থবিশেষ শ্রদ্ধেয় হয়, তবে কেবল চরক ও সুশ্রুত অধীত হয় কেন? ভেল প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় তন্ত্র এক-প্রকার বর্জ্জিত হইয়াছে কেন? অতএব, কেবল গ্রন্থনিবিষ্ট বিষয়-গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই গ্রন্থের সারত্ব সম্বন্ধে বিচার করা উচিত"। পরবর্ত্তী স্থলে আবার বলিতেছেন:—"ঔষধের গুণ লইয়াই যখন কথা, ব্রহ্মা স্বয়ং প্রয়োগ করুন বা অপর কেহ প্রয়োগ করুন তাহাতে ক্ষতি নাই"।

মহাত্মা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক এতদ্দেশে রসায়নীবিদ্যার যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। চক্রপাণি বলেন, তিনি যে লৌহ-রসায়ন ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রথম বিবৃত। রসেন্দ্রচিন্তামণিকার মতে তিনিই রাসায়নিক তির্য্যক্‌পাতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা।

প্রাচীন ভারতে কেবল যে দর্শন ও সাহিত্য উন্নতির পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল এমন নহে। আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রেরও বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে--এ সমস্ত বিদ্যা কি প্রকারে লোপ পাইল? কেহ কেহ বলেন, মুসলমান আধিপত্যে রাজন্যগণ শ্রীভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হওয়াই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু তৎসাময়িক ইতিহাস-পাঠে এই যুক্তি সারগর্ভ বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমানদিগের আর্য্যাবর্ত্ত জয়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আর তাহাই যদি হইত, তবে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিদ্যার আলোচনা দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কারণ তথায় মুসলমান-আধিপত্য কখনও স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানদিগের শাসনকালে বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরে হিন্দুশাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। এই উভয় স্থানই নবাবের রাজধানীর সন্নিকট ছিল। স্থূলভাবে বলিতে গেলে, উপনিষদ রচনাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত সময় মধ্যে হিন্দুর মস্তিষ্কচালনা বা মানসিক চিন্তার দ্বারা যাহা কিছু গৌরব করিবার বিষয় তাহা সাধিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ এই সময়কে অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৭০০ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ভারতের জ্ঞানোন্নতি বা স্বাধীন চিন্তার যুগ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে পাণিনি

সাহিত্যজগতে অতুলনীয় ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন; অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতেজা ঋষিগণ ষড়্‌দর্শন রচনা করেন এবং বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" ধ্বজা উত্তোলন করিয়া সাম্য, মৈত্রী এবং সর্ব্ব-জীবে ভ্রাতৃভাব জগতে ঘোষণা করিয়া সমগ্র মানব-হৃদয়ে উচ্চাকাজ্ঞার আদর্শ উপস্থিত করেন। আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং বরাহমিহির প্রভৃতি মনস্বিগণ জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু হায়! চির দিন কখনও সমান যায় না; উন্নতি ও অধোগতির চক্রবৎ পরিবর্ত্তন হইয়েছে। কি প্রকারে স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞানচর্চ্চা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রেরই বিবেচনার বিষয়।

সমাপ্ত